Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-III, April 2021, Page No.17-36
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব : প্রসঙ্গ রাজবংশী প্রবাদ

রাজেশ খান
গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
নবনীতা বর্মন
গবেষিকা, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ড. সুজয়কুমার মণ্ডল
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Proverb is a popular genre of Folklore as well as an oral literature. This proverb, which has been popular for a long time, was relevant in ancient time too, as it is in human life today. Frankish and sharp expressions of the daily life of the people are expressed through Proverbs. Proverbs reflect actual settings or live scenario of the society, and the Rajbonsi proverbs are no exception.

All those expressions of the intellectual consciousness of the Rajbonsi Society, also hold proverbs; like different folkloric genres. Sociologists firmly believe that cultural expression manifests itself in different ways through art-literature-culture. In the Rajbangsi proverbs, various social elements are manifested as indicators of the intellectual consciousness. The present article will try to explore the sociological aspects of Rajbangshi proverbs and its importance.

১. শুরুর কথা: লোকসংস্কৃতি তথা লোকসাহিত্য বা মৌখিক সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা (Genre) হল প্রবাদ (Proverb)। সুদীর্ঘকাল থেকে লোকমুখে প্রচলিত হয়ে আসা এই প্রবাদ যেমন সুপ্রাচীনকালেও প্রাসঙ্গিক ছিল, আজও মানব জীবনে ঠিক ততটাই প্রাসঙ্গিক। লোকসমাজের দৈনন্দিন, নিত্য-নৈমিত্তিক অভিজ্ঞতার সরস ও সুতীক্ষ্ণ অভিব্যক্তি প্রবাদ রূপে মানব মনে ঐতিহ্য পরম্পরায় প্রবহমান। স্থান ও কালের পরিবর্তনে কখনোও কখনোও তার বহিরঙ্গের রূপভেদ লক্ষ্য করা গেলেও প্রবাদ চিরকালই সমাজের বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলে। রাজবংশী প্রবাদও এর ব্যতিক্রম নয়। একবিংশ শতকের বিশ্বায়নের আগ্রাসন লোকসমাজের নানাবিধ বিষয়কে প্রভাব বিস্তার করলেও প্রবাদ তার গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রায়োগিকতাকে আজও একইভাবে অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ বলে মনে করা হয়।

বাংলার উত্তরাংশে তথা উত্তরবঙ্গে বসবাসরত রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিকতা এবং বিশ্বায়নের প্রভাব তাদের জীবনাচারণে ব্যপক প্রভাব বিস্তার করেছে। সেহেতু তাদের দ্বারা লালিত-পালিত সংস্কৃতির রেণুতেও সেই প্রভাব ধারা লক্ষ্যণীয়। ক্ষেত্রবিশেষে তা রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত হয়। আবার কখনও কখনও তা স্ব'চরিত্র অক্ষুন্ন

রাখতে সচেষ্ট। রাজবংশীদের বৌদ্ধিক চেতনার ঐ সকল প্রকাশ বিভিন্ন লোকআঙ্গিকের মতো প্রবাদও ধরে রাখে। সমাজবিজ্ঞানীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশ (Cultural Expression) শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে বা আধৃত (Captured) থাকে। ঠিক সমভাবে, প্রবাদে অনেক সামাজিক উপাদান অন্তর্লীত (Implicit) থাকে, যা সমাজ-সচেতন বা অনুসন্ধিৎসুরা সহজেই খুঁজে পান। রাজবংশী প্রবাদে, নানান সামাজিক প্রপঞ্চ বা উপাদান বৌদ্ধিক চেতনার দ্যোতক হিসেবে আত্মপ্রকাশিত। বর্তমান গবেষণাপত্রটিতে 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব' রাজবংশী প্রবাদে উদ্ভাষিত সমাজতত্ত্বগত দিকগুলির প্রতি আলোকপাত করা হবে।

২. সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব: ধারণা ও পরিসর এবং আলোচনার প্রেক্ষিত: 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব'- এই ধরনের আলোচনার মূল ভিত্তি হল আন্তঃবিদ্যাশৃঙ্খলাগত ভঙ্গি (Interdisciplinary Approach)। আলোচনায় মূলত দু'টি বিদ্যাক্ষেত্রের সমাপতন এবং তাদের মধ্যে আন্তঃপ্রবেশী সম্পর্ক বিদ্যমান। অনেক সমাজবিজ্ঞানী আবার 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব'কে (Sociology of Literature) পৃথক শাখা (Separate Discipline) হিসাবেই পরিচয় দিতে বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করেন। 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব'-এর (Sociology of Literature) উৎপত্তি ও বিকাশ প্রসঙ্গে শিপ্রা সরকার জানিয়েছেন (সরকার, ২০০৭: ২৯):

> "ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমাজবিজ্ঞানে 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব' নামক শাখাটির উৎপত্তি ঘটেছে। বস্তুত, মার্কস ও এঙ্গেলস-এর বিভিন্ন লেখার সূত্র ধরে সাহিত্য-সমালোচক, ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানীরা সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব বিষয়টির গোড়াপত্তন করেন। অতঃপর লেলিন, ম্যাক্সিম গোর্কি, প্লেখানভ, লুনাচারস্কি, ট্রটস্কি, ডিমিট্রভ, মাও সে-তুং, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, রালফ ফক্স, লুকাচ, আর্নস্ট ফিশার, লুসিয়ান গোল্ডম্যান, হার্বার্ট মার্কিউস, রেমন্ড উইলিয়ামস্, থিয়োডর এডরনো, ওয়ালটার বেঞ্জামিন, জ্যাঁ পল সার্তে, টেরী ঈগলটন, লুইস এ.কোজার প্রমুখ দার্শনিক-সমালোচক-সমাজবিজ্ঞানীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-বিতর্কের মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দীতে এসে সমাজবিজ্ঞানের এই শাখাটির বিচিত্র বিকাশ ঘটে।"

– সুতরাং সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব চর্চায় স্বনামধন্য সাহিত্য-সমালোচক ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানীদের অবদান এই ধারার চর্চাকে মহিমান্বিত করেছেন এবং তা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয়ে বিংশ শতাব্দীতে এসে বহুমাত্রিক বিকাশ ঘটেছে এবং এই বিকাশকে ত্বরান্বিত করে বহুমুখী রূপ দেবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, সাহিত্য ও সমাজতত্ত্ব হল আন্তঃপ্রবেশী চরিত্রধর্মী। সমাজবিজ্ঞান ও সাহিত্যের সম্পর্ক সূত্র উত্থাপন প্রসঙ্গে এ.কে. নাজমুল করিমের একটি উক্তি প্রসংক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে (সরকার, ২০০৭: ২৬):

> "সমাজবিজ্ঞান সাহিত্য নয়। সমাজ-বৈজ্ঞানিক যতক্ষণ বৈজ্ঞানিক ততক্ষণ সে সাহিত্যিক হ'তে অপারগ। সাহিত্যিক সমাজ-বৈজ্ঞানিক না হলেও, সমাজ-বৈজ্ঞানিকের চিন্তাধারা সম্পর্কে তাঁকে ওয়াকিবহাল হতে হবে, তা'না হলে তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা ব্যর্থ হবে।"

– বক্তা আলোচ্য বক্তব্যে সমাজবিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকের অন্তর্ভেদী সক্ষমতায় দক্ষ হবার ইঙ্গিত উল্লেখ করেছেন। অত্যন্ত সচেতন সাহিত্যিকই সমাজবেত্তা সুলভ দৃষ্টি নিয়ে তাঁর সাহিত্য সম্পদ সৃজন করে থাকেন, তাঁদের সৃষ্টিতে সমাজের বহুবিধ দিক ফুটে ওঠে। সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের মৌল বৈশিষ্ট্য নির্দেশক একটি উক্তির প্রেক্ষিতে শিপ্রা সরকার 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব' শাখার প্রধান লক্ষ্য সম্পর্কে জানিয়েছেন (সরকার, ২০০৭: ২৬-২৭):

> "সাহিত্যকর্মের সমাজতাত্ত্বিক উপাদান পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা এবং তার মধ্য থেকে সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপাদান সমূহ উদ্ধার করা সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের মূল কাজ। একটি বিশেষ সমাজের সামাজিক ইতিহাস, উৎপাদন ব্যবস্থা, লেখক ও পাঠকদের সামাজিক অবস্থান, সামাজিক স্তরবিন্যাস, সমাজে বহুমাত্রিক চিত্র কীভাবে বিশেষ কোনো সাহিত্যেকর্মে প্রতিফলিত হলো, তা খুঁজে বের করাই সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব নামক জ্ঞানের এই শাখাটির প্রধান লক্ষ্য।"

- সমাজতত্ত্ব (Sociology) সমাজবিজ্ঞানের (Social Studies) বিষয়গত পরিধির বিষয়। অন্যদিকে, সাহিত্য কলাবিদ্যার (Arts) বিষয়গত পরিধিতে পড়ে। দু'টি বিষয়ের (Discipline) ক্ষেত্রেই সমাজ-জীবন, আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ঘটমান সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি স্থান পেয়ে থাকে। অবশ্য আলোচনা বা উপস্থাপন বা অধ্যয়নের ভঙ্গিগত পার্থক্য রয়েছে। তবে আমরা খুব সহজভাবে বলতে পারি, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী যখন সাহিত্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আধেয়, সাধারণার্থে তখন সেই চর্চার ভঙ্গিই 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব' (Sociology of Literature)।

'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব' (Sociology of Literature) - এই তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে সাহিত্যে কিছু আলোচনা নজরে এলেও, এখনো অবধি লোকসাহিত্যের কোন উপাদান নিয়ে বাংলাতে এমন চর্চার নজির নেই। অথচ লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান - ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, লোককথা বিভিন্ন উপাদানকে 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব'- প্রেক্ষিতে অধ্যয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের (Social Studies) চিন্তাসূত্রকে কাজে লাগিয়ে যদি কলাবিদ্যায় (Arts) প্রয়োগ সম্ভব হয়, তবে অবশ্যই সমাজবিজ্ঞানের (Social Studies) চিন্তাসূত্রকে সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় (Discipline) প্রয়োগ করে আলোচনাকে আরোও ত্বরান্বিত করা সম্ভব। চরিত্রগত দিক থেকে লোকসাহিত্য দু'জননী কলাবিদ্যা (Arts) ও সমাজবিদ্যার (Social Science) আদর উপভোগ করে মিশ্র প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যে বিন্যস্ত। অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও এই প্রকৃতি লক্ষ্যণীয়। এই সূত্রেই উল্লেখ্য, সমাজবিজ্ঞানের (Social Studies) অন্যতম বিষয় (Discipline) লোকসংস্কৃতি তথা লোকসাহিত্যের একটি প্রাণবন্ত উপাদান প্রবাদেরও 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব'- প্রেক্ষিতে অধ্যয়নের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কেননা, প্রবাদে একটি বিশেষ সমাজের সামাজিক ইতিহাস থেকে শুরু করে উৎপাদন ব্যবস্থা, ভূমি ব্যবস্থা (সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সামন্তবাদী শোষণ), সামাজিক স্তরবিন্যাস, শ্রেণি বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণি দ্বন্দ্ব, ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা ব্যবস্থা, নগরায়ণ ও তৎকালীন নগরজীবন, নারীর সামাজিক অবস্থান, দেবদেবীর চরিত্র নির্মানে সমাজ বাস্তবতার প্রতিফলন, সমাজের বহুমাত্রিক চিত্র - ইত্যাদি দিকগুলি চিত্রিত হতে দেখা যায়। আর তা অন্বেষণ করাই 'সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব' নামক জ্ঞানের এই শাখাটির প্রধান লক্ষ্য।

৩. রাজবংশী লোকসাহিত্য ও প্রবাদ: মৌখিক সাহিত্য চর্চার পরিসর: মৌখিক সাহিত্য যা লোক মুখে সৃষ্ট হয়ে লোক মুখেই এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রবাহিত হয়। লোকসাহিত্যের আঙিনায় প্রবাদ একটি অন্যতম মাধ্যম যা দীর্ঘ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ফসল। প্রাবাদ, সাহিত্য সৃজনশীলতার এমন এক মাধ্যম যেখানে মনের ভাব অত্যন্ত সাবলীলভাবে প্রকাশ পায়। লোক মননজাত বিভিন্ন উপাদান লোক পরম্পরায় প্রবাহিত হয়। লোক মুখ সৃষ্ট উপাদানগুলি মৌখিক সাহিত্যান্তর্গত। মৌখিক সাহিত্যগত দিক থেকে রাজবংশী লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। মৌখিক সাহিত্যের এই অংশগুলি হল- ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, লোককথা প্রভৃতি। প্রত্যেক সমাজের লোকআঙ্গিক উপস্থাপনের স্বকীয় ভঙ্গি রয়েছে। অঞ্চলভেদে, গোষ্ঠীভেদে এই আঙ্গিকগুলির নাম বদলে যায়, এক কথায় বলা যায় আঙ্গিকগুলির নামের মধ্যেও কোন গোষ্ঠীর স্বকীয় বৈশিষ্ঠ্যের মাধুর্য লক্ষ্য করা যায়। রাজবংশী সমাজে মৌখিক সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকগুলির নিজস্ব কিছু নাম রয়েছে। প্রবাদকে রাজবংশী ভাষায় 'শোলোক', 'সেল্লুক', 'সোলোক', কোথাও 'ফাকিরি' বলা হয়। ঠিক তেমনি ধাঁধাকে 'ভাঙতি', 'শোলোক' প্রভৃতি বলা

হয়। কখনও কখনও ছড়া, ধাঁধা ও প্রবাদ এই তিন আঙ্গিককেই 'ছিল্‌কা' বলা হয়ে থাকে। তবে লোককথাকে 'কিচ্চা' বা 'বুড়াবুড়ির কথা'ও বলা হয়।

বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারাও সুদীর্ঘকাল পাশ্চাত্য অনুসারী ছিল – এবিষয় অস্বীকারের কোন জায়গা নেই। পাশ্চাত্যের মতোই বাংলাতে প্রথম পর্বের লোকসংস্কৃতি চর্চা সংগ্রহ ও সংকলনের মধ্য দিয়ে অধ্যয়ন প্রসারতা পায়। এবং পরে বিচার ও বিশ্লেষণের দিকে গবেষকগণ নজর দেন। প্রবাদের ক্ষেত্রে এই একই বক্তব্যই প্রযোজ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রবাদ চর্চায় বৃহত্তর অর্থে আমরা দু'ধরনের গবেষককে লক্ষ্য করি। যেমন, এক প্রবাদের সংগ্রহ ও সংকলক এবং অপরটি হল প্রবাদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষক। আশ্চর্যের বিষয় প্রবাদের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের যে মাত্রা পাবার কথা তা পায়নি। রাজবংশী প্রবাদের ক্ষেত্রে ওই একই বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে প্রবাদকে বুঝে নেবার তাগিদ খুব কম সংখ্যক লেখক-গবেষকই দেখিয়েছেন। প্রবাদ সংগ্রহ ও সংকলন এবং বিচার ও বিশ্লেষণের ফলে সমগ্র বিশ্বের প্রবাদের মধ্যে বৈশ্বিক সমরূপতা (Global Similarities) যেমন দেখা যায়, তেমনি জাতীয় স্বতন্ত্র (National Specificities) বৈশিষ্ট্য-সত্ত্বারও সজীবতা লক্ষণীয়। এলাকা-ভাষা-জাতি-সংস্কৃতি ভেদে সারা বিশ্বব্যাপী অজস্র প্রবাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রাজবংশী প্রবাদের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। একদিকে এলাকা-ভাষা-জাতি-সংস্কৃতি, অন্যদিকে চিন্তা-চেতনা-ভঙ্গী ভেদে নানাভাবে প্রবাদকে বিশেষায়িত করা সম্ভব। মৌখিক সাহিত্য-চর্চার পরিসরে রাজবংশী প্রবাদের বিশ্লেষণ সম্ভব। তাতে করে রাজবংশী প্রবাদ অধ্যয়নের বহুমুখীন দিক খুলে যাবে। সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের প্রেক্ষিতে রাজবংশী প্রবাদ বিশ্লেষণ – এমনই একটা নতুনত্ব দিক নিয়ে আলোচনার অবতারণা মাত্র।

৪. রাজবংশী প্রবাদে সমাজতত্ত্ব: বহুমাত্রিক প্রেক্ষিত: প্রবাদে নানান ধরনের সামাজিক উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অন্য দিকে, সমাজ কাঠামোর পরতে পরতে মানুষের অবদান এবং মানুষ এই সমাজেরই অন্তর্গত; তাই সাহিত্যের মধ্যে সমাজ এবং মানব একাকার হয়ে থাকে। প্রবাদ এমনই এক সাহিত্যগত উপাদান যেখানে মানব সমাজের সামাজিক বিভিন্ন দিক অত্যন্ত সজীব ও সাবলীলভাবে প্রকাশিত হয়। রাজবংশী প্রবাদের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে সমাজতত্ত্বের বহুবিধ দিককে তুলে ধরা হবে।

৪.১ ভূমি ব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সামন্তবাদী শোষণ: উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তনশীল কাঠামোর অনুপঙ্খ বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন শিনগিচি তানিগুচি। ভূমি ব্যবস্থার মালিকানা সম্পর্কে বলতে গি**য়ে** তিনি জানি**য়ে**ছেন (বন্দোপাধ্যায় ও দাশগুপ্ত, ১৯৯৮: ১৫৪):

> ".....হিন্দু ধর্মের প্রচার এবং রাষ্ট্রগঠন যতই অগ্রসর **হয়** উপজাতী**য়** সমাজব্যবস্থা ততই **দূ**র্বল হতে থাকে। ধীরে ধীরে সম্প্রদা**য়**ভিত্তিক ভূমি মালিকানা থেকে গুরুভার খাজনার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত ভূমি মালিকানা স্থান লাভ করে।"

— এর ফলেই উপজাতীয় জাতি ব্যবস্থা আস্তে আস্তে ভেঙ্গে যায়। জাতি ব্যবস্থার কড়াল আঘাত নেমে আসে উপজাতীয় জাতি ব্যবস্থাতে। তিনি আরোও জানান, বিত্তশালী কৃষকগোষ্ঠীর উদ্ভব পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবসায়ী মহাজনের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা উপজাতীয় জাতিগোষ্ঠীকে দূর্বল করে তোলে। বস্তুত, ভূমি ব্যবস্থার ক্ষমতা ধারণের ক্ষেত্রেও সেই কোপ পড়ে (বন্দোপাধ্যায় ও দাশগুপ্ত, ১৯৯৮: ১৫৪)। সামাজিক এই ঘটনা-রেণু রাজবংশী প্রবাদে বিশেষ রূপ পেয়েছে, যেখানে রাজবংশী সমাজের ভূমি ব্যবস্থা, সমাজের সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সামন্তবাদী শোষণ চিত্র ধরা পড়ে। কয়েকটি প্রবাদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে বিষয়টি পরিস্কার হবে। যেমন; 'হালুয়ায় হাল চাষায়, কৃষক গাড়ে ধান / আগোত খায় চর চাট্টা পাছোত্ খায় কিষ্যান' — রাজবংশী সমাজের সামন্তবাদী শোষণের বাস্তব চিত্র ধরা পড়েছে। অর্থাৎ কৃষক কষ্ট করে হলকর্ষণ করে ধান রোপন করে, কিন্তু সেই কৃষকই তার কষ্টের ফসল ভোগ করে সবার শেষে। সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শোষণের ধারায় এ এক অনন্য চিত্র। আধুনিক অর্থে সবচেয়ে বেশি করে যার 'ক্রেডিট' তথা অংশীদার পাওয়া উচিত ছিল অর্থাৎ কৃষকের, অথচ সম্পদ ভোগ দখলের ক্ষেত্রে সেই

সবচেয়ে বেশি করে অন্যায় তথা শোষণের স্বীকার। আরেকটি প্রবাদে শোষণের অপর চিত্র ধরা পড়েছে: 'হাসে ত ডিমা পাড়ে,/ গিরির তো মনতে না খায়।' — ডিম পাড়ার সময় হাঁসের যে কষ্ট হয় তা গিরি বা মানুষের (গিরি-মহাজন বা মালিক বা জমিদার বা ধনবান ব্যক্তি) মনে থাকে না, উপরন্তু ডিমের পরিমাপ নিয়ে তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যায়। তেমনি ফসল উৎপাদনে কৃষকের যে কষ্ট তা জমির মালিক এবং জমিদারেরা বোঝেন না। রূপকের আশ্রয়ে এই করুণ রসাত্বক চিত্র বাস্তব রূপ পেয়েছে।

ধনবান বা বলবানেরা ক্ষমতার কেন্দ্রে থেকে সমাজের কোরক গ্রহণ করার জন্য সমাজ ব্যবস্থাকে সুচতুর কৌশলে সংগঠিত করে বিভিন্ন কুচক্রের জাল বিছিয়ে রাখেন। রাজবংশী সমাজেও এমন ঘটনা সচরাচর নয়, অহরহ ঘটে থাকে। একটি প্রবাদের দৃষ্টান্তে বলা হয়েছে: 'আটিয়া কেলার পিরি/ মনুয়া কলার পিরি/ মোক যে গোলাম নিবার চাইস/ কয়শ টাকার গিরি' — এই প্রবাদটিতে উল্লিখিত দুই প্রকার কলার অনুষঙ্গে একজন নারী কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেছে যে, সে বীচি কলা এবং মর্তমান কলার কাঁদির মতই শক্ত এবং বড়, তাই কত বড় ধনী যে আমাকে বিয়ে করতে চাও। তবে প্রবাদটি যে উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করা হোক না কেন, এর মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত একটি প্রথার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে; সমাজের ক্ষমতা সম্পন্ন ধনী ব্যক্তিরা নিজেদের অর্থের বলে দরিদ্র ব্যক্তিদের নিজের গোলাম বা দাস হিসেবে নিয়োগ করতো। যা সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার চিহ্নায়ক। অন্যদিকে, ক্ষেত্রসমীক্ষার এক সূত্রে জানা গেছে, কয়েক যুগ আগে রাজবংশী সমাজে পাত্রকে কন্যা বা পাত্রীকে পণ দিয়ে বিয়ে করতে হত। সে সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। কোন পুরুষের নারীকে পছন্দ হলে সেই পুরুষ কতটা বিত্তবাণ তার পরিচয় দিতে হত। কেননা নারী নিজেকে মনে করতো, সে বীচি কলা এবং মর্তমান কলার কাঁদির মতই শক্ত এবং বড়; যে কারণে তার সামাজিক মর্যাদা অনেক বেশি। তাই তাঁকে বিয়ে করতে গেলে বা গোলাম অথবা দাস হিসেবে নিয়োগ করতে গেলে অর্থনৈতিকভাবে অনেক বেশি বলবান হতে হবে। সুতরাং প্রবাদটিতে মূলত দু'টি দিক ফুটে উঠেছে, যথা সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও প্রাচীন বিবাহরীতি। এছাড়াও 'উজান ভুঞি যার / ভাটী মাল্লি তার', 'জোড় যার মুল্লুক তার', 'দেউনিয়ার পাদোত্ গোন্ধ নাই' — এই ধরনের প্রবাদগুলির মূল ভিত্তিই হল সমাজের সামন্ত্রতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা। 'উজান ভুঞি যার / ভাটী মাল্লি তার' অর্থাৎ উঁচু জমি যার সেই জমির নীচের আলও তার।
'দেউনিয়ার পাদোত্ গোন্ধ নাই' — দেউনিয়া- প্রভাবশালী ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির পাদে বা নিম্ন বায়ু দুর্গন্ধহীন। অর্থাৎ প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের দোষ কোন দোষ বলে প্রতিপন্ন হয় না। সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্যায় বা অপরাধ সমাজ কাঠোমিক ক্ষমতার অবৈধ বণ্টনে তা মিলিয়ে যায়। এক কথায় বলে না, 'জোর যার মুল্লুক তার'।

৪.২ সামাজিক স্তরবিন্যাস: জাতি-বর্ণ প্রথা ভারত তথা ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই প্রথার নেতিবাচক প্রভাবও সমাজ পরিকাঠামোর বিভিন্ন প্রেক্ষিতে লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃতির রেণু-রেখায় ধরা রয়েছে এই প্রথার বিভিন্ন দিক। সভ্যতার সমাজ বিকাশে আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত মানবসমাজে চার ধরনের সমাজবিন্যাস তথা সামাজিক স্তরায়ন পরিলক্ষিত হয়। যথা; ১. দাস প্রথা, ২. মধ্যযুগীয় 'এস্টেট', ৩. 'জাতি-বর্ণ প্রথা' (Caste System) এবং ৪. 'সামাজিক শ্রেণী ও মর্যাদা গোষ্ঠী' (চৌধুরী, শামীম, রহমান ও হক, ২০১৬: ৩০৪)। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে মূলত 'জাতি-বর্ণ প্রথা' (Caste System) এবং 'সামাজিক শ্রেণী ও মর্যাদা গোষ্ঠী' — লক্ষ্য করা যায়। আমাদের বিবেচ্য বিষয়, রাজবংশীদের ক্ষেত্রে এমন কোনো সামাজিক স্তরবিন্যাস কী লক্ষ্য করা যায়? যদি লক্ষ্য করা যায়, তবে তা রাজবংশী প্রবাদের প্রেক্ষিতে কতটা ব্যাখ্যাযোগ্য বা প্রবাদ-প্রবচনে কতটা উঠে এসেছে তা তুলে ধরা। প্রথমে আমরা সামাজিক স্তরবিন্যাস বা সামাজিক স্তরায়ন সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে সাধারণ ধারণা তুলে ধরতে পারি।

সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পারসন্স সামাজিক স্তরবিন্যাস নিয়ে যুক্তিগ্রাহ্য মতামত তুলে ধরেছেন 'Social Structure and Personality'- শীর্ষক গ্রন্থে। ট্যালকট পারসন্সের বক্তব্যের ভিত্তিতে আমরা কয়েকটি নির্বাচিত কুঁজি শব্দকে (Key Words) চয়ন করতে পারি (মহাপাত্র, ২০১৭: ৪৯০):

১. সামাজিক স্তরবিন্যাস হল 'প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা'
২. 'সামাজিক অসাম্যে'র ফলেই এটির সৃষ্টি হয়
৩. 'বংশানুক্রমিকভাবে কায়েমকৃত' একটা ব্যবস্থা
৪. 'ঐতিহ্য দ্বারা আরোপিত'

— সর্বোপরি উঁচু এবং নিচু বিবেচনার ভিত্তিতেই এ ধরনের সামাজিক স্তরবিন্যাস সৃষ্টি হয় বলে তিনি মনে করেন। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানী টিউমিনের অভিমত, মানবিক সম্পর্কের স্তরবিন্যাসই সামাজিক স্তরবিন্যাস (মহাপাত্র, ২০১৭: ৪৯১)। এক সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে বোঝানো হয়েছে (চৌধুরী, শামীম, রহমান ও হক, ২০১৬: ৩০৪):

> "... এক বা একাধিক বিষয়ের মান বা নীতির ভিত্তিতে ক্রমোচ্চভাবে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা। স্তরগুলো উর্দ্ধতন ও অধস্তন অবস্থানের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়। সাধারণ একটি সমাজকে উৎপাদন উপায়ে মালিকানা ও অমালিকানা (মালিকানা ও অমালিকানা সম্পত্তির) মর্যাদা এবং ক্ষমতার অসম বন্টনের ভিত্তিতে ক্রমোচ্চভাবে বিন্যস্ত একাধিক স্তরে ভাগ করা যায়। সমাজের স্তরবিভাগ আয়, পেশা, নরগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য, এমন কি বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক এবং মানসিক গুণাবলী ইত্যাদি নানা বিষয়ের মানের ভিত্তিতেও সম্ভব।"

— গ্রাম নির্ভর ভারতবর্ষের কৃষি হলো অর্থনীতির মূল ভিত্তি। অন্যদিকে আচার-আচরণ, রীতিনীতি, অনুষ্ঠানাদি সমস্ত কিছুই নির্ভরশীল সামাজিক স্তরবিন্যাসের উপর। বহুলাংশে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায়। বিভিন্ন বিনিময় প্রথা, গ্রামীণ অর্থনীতি পরিচালিত হয় সামাজিক স্তরায়নের উপর নির্ভর করে। ঠিক এভাবেই কৃষিকেন্দ্রিক রাজবংশী সমাজেও সামাজিক প্রতিপত্তি বা মর্যাদার ওপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাজন লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান কালেও এই সমাজ মানসে তা বিদ্যমান। এই সমাজ-জীবন মূলত কৃষিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত। আর সে কারণে আর্বিভাব হয় জমিদার, জোতদার, বর্গাদার, আধীয়ার শ্রেণির। সামাজিক মর্যাদায় জমিদার বা জোতদার উচ্চাসনে আসীন, অপরদিকে আধীয়াররা ছিল সামাজিক মর্যাদায় সবচেয়ে নিচু তলার মানুষ। তবে সামাজিক মর্যাদায় বিভেদ থাকলেও এই সমাজ ব্যাবস্থায় দুই শ্রেণির মধ্যে পারস্পরিক হৃদ্যতারও চরম নজির আছে। রাজবংশী প্রবাদের প্রেক্ষিতে বিষয়গুলোকে বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

যেমন রাজবংশী এক প্রবাদে বিত্তশালী ও অর্থহীন দূর্বলদের পরিস্থিতির কথা এভাবে উল্লেখিত হয়েছে: 'অলপ্ পাইসা যার/ ঘ্যাগা বাইগন তার।' (অর্থ: অলপ্- অল্প, পাইসা-টাকা, ঘ্যাগা- ঘ্যাগ যুক্ত নিকৃষ্টমানের, বাইগন- বেগুন) — অর্থাৎ যার অর্থ কম তার জন্য নিকৃষ্ট মানের পঁচা বেগুন বরাদ্দ। অর্থাৎ সমাজের যা কিছু ভাল তা বিত্তশালীদের জন্য বরাদ্দ এবং অর্থহীন দুর্বলদের জন্য নিকৃষ্টতম বস্তুই বরাদ্দ। এই প্রবাদটি সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রেক্ষিতে ধনী দরিদ্রের বিভেদ বা বৈষম্য তুলে ধরেছে। অন্যদিকে আরেকটি প্রবাদে বলা হয়েছে: 'এ্যাকে থোপের বাঁশ / তবুও ভিন্ ভাস। / কাঁও হয় সাজি কাওবা ঝাটা।' (অর্থ: এ্যাকে- একই, থোপের- ঝার, ভিন্- পৃথক, ভাস- আচরণ বা চলন বা ব্যবহার, কাঁও- কেউ, সাজি- ফুলের ঝুরি, কাওবা- কেউবা) — অর্থাৎ একই ঝাড়ের বাঁশ হওয়া সত্ত্বেও সব বাঁশের ব্যবহার একই রকম হয় না। কোন বাঁশ ফুলের সাজি তৈরিতে আবার কোন বাঁশ ঝাটা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ঠিক তেমন ভাবেই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির লোকেরা প্রত্যেকেই মানুষ কিন্তু তা সত্ত্বেও সকলের গুরুত্ব বা সম্মান একই থাকে না। আসলে এখানে রূপকার্থে প্রবাদের বক্তব্য প্রকাশিত। এভাবে আমরা বেশ কয়েকটি রাজবংশী প্রবাদের কথা তুলে ধরতে পারি:

১. 'কাঁও খাবার না পায় ডাইল্ / কারো ভাঙ্গি যায় আইল্।' (অর্থ: কাঁও- কেউ, ডাইল- ডাল, ভাঙ্গি যায়- ভেঙ্গে যায়, আইল- আল) — অর্থাৎ কেউ ডাল খেতে পায় না আবার কারো খাদ্যের আতিশয্যে আল ভেঙ্গে যায়। অর্থাৎ

একদিকে অভাব-অনটন অন্যদিকে প্রাচুর্য। সমাজে উৎপাদিত দ্রব্যের মালিকানা ও অমালিকানা, সম্পত্তির প্রাচুর্যের প্রেক্ষিতে মর্যাদা এবং ক্ষমতার অসম বন্টনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বর্তমান প্রবাদটি।

২. 'তিত্ কইল্যার পাত্, ন্যাদাই খাওয়ার জাত্।' (অর্থ: তিত্- তেতো, কইল্যার- করলা বা উচ্ছে, পাত্- পাতা, ন্যাদাই- লাথি) — অর্থাৎ তেতো করলা উপকারি সবজি কিন্তু এই সবজিকে লোকে তার তেতো স্বাদের জন্য অবহেলা করে। একই রকমভাবে সমাজের উপকারি মানুষেরা অপ্রিয় হয়ে থাকেন। সামাজিক অসাম্যতা, মানবিক সম্পর্ক এবং সামাজিক শ্রেণি ও মর্যাদার নিরিখেই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সমাজে পরিত্যাজ্য হন।

৪.৩ শ্রেণি বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণি দ্বন্দ্ব: শ্রেণি বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণি দ্বন্দ্ব নিয়ে আলোচনা অপ্রতুল নয়। লোকসংস্কৃতির উপাদান কেন্দ্রিক আলোচনায় বিভিন্ন পরিসরে শ্রেণি বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণি দ্বন্দ্বের আলোচনা স্থান পেয়ে থাকে। এই প্রেক্ষিতে অনুসন্ধিৎরা অবশ্যই জানেন মার্কসীয় পদ্ধতি বা ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী পদ্ধতির আলোচনা প্রসঙ্গ কী ভাবে লোকসংস্কৃতির আধারে আলোচিত হয়েছে। আমরা জানি, শ্রেণিবিভাজনগত কারণে সমাজে উঁচু-নিচুর দ্বন্দ্ব সুগঠিত রূপ পায়। এই দ্বন্দ্ব মূলত ডোমিনিয়ন ক্লাসের সঙ্গে সাব-অর্ডিনেট ক্লাসের মধ্যে। সমাজে এই উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ নানান অসাম্য জনিত কারণে সংঘটিত হতে পারে। যথা, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি নানাবিধ কারণে। সমাজের উঁচু স্থানে অবস্থিত ব্যক্তিরা বরাবরই তদপেক্ষা নিম্নকোটির মানুষের সঙ্গে উক্ত দ্বান্দিক সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে নানাভাবে এই দ্বান্দিক সম্পর্ক সূত্র উত্থাপিত হয় (ইসলাম, ২০১১: ১৭১-১৭২)। সাব-অর্ডিনেট ক্লাসের সমাজ প্রতিভূরা সরাসরি সামাজিক অসাম্যতার কথা তুলে ধরতে অসামর্থ্য হন। তখন লোকসাহিত্যের আঙ্গিকগুলোই হয়ে ওঠে আলম্বণ। রাজবংশী প্রবাদেও শ্রেণি বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণি দ্বন্দ্ব অনুষঙ্গের ব্যপকতা পরিলক্ষিত হয়। কিছু প্রবাদের দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিস্ফূট হবে।

কাক ও কোকিলকে নিয়ে একটি প্রবাদ অতি পরিচিতি রয়েছে: 'কাউয়ার ভাসাত্ কুকিলের ছাও, / জাত স্বভাবে করে রাও'। কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। তার বাচ্চা কাকের বাসায় পালিত হলেও সেই বাচ্চা কোকিলের স্বভাবধর্ম কখনই ত্যাগ করে না। প্রবাদটিতে কে কোন শ্রেণির ব্যক্তি, তার নিজস্ব শ্রেণি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। আসলে এই ধরনের প্রবাদগুলি উপমাত্বক। কাকের কর্কশ ধ্বনি কোকিলের কণ্ঠের কাছে হার মানায়। কোকিল এখানে উচ্চকোটির প্রতিনিধি। সে প্রয়োজনের তাগিদে কাকের আশ্রয় নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কোকিলের স্বভাবাচরণ কখনই পরিবর্তিত হয় না। সে যতই কাকের সঙ্গে মেলা-মেশা করুক বা ঘনিষ্টে আসুক। প্রাসঙ্গিকভাবে আরোও একটি দৃষ্টান্তের আশ্রয় আমরা নিতে পারি - 'কালা বামন গোড়া হাড়ি / খাটো মোছলমান বজ্জাতের তাড়ি'। অর্থাৎ, কালো বা কৃষ্ণ গাত্রবর্ণের ব্রাহ্মণ, গৌড় বর্ণের ডোম এবং বেটে মুসলমান এই তিন সম্প্রদায়ই বজ্জাতের কেন্দ্র হয়ে থাকে। এই তিন সম্প্রদায়কেই একই শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। এখানে শ্রেণি বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি ধর্মীয় ভেদাভেদের ভিত্তিতে দ্বান্দিক সম্পর্ককে তুলে ধরা হয়েছে। এমন ধরনের বেশ কিছু প্রবাদ রাজবংশী সমাজে প্রচলিত রয়েছে। যথা; 'কালা বামন খাটো মোছলমান / আর ঘর জামাই - তিনে সমান', 'কালা গোরা একে নাকান্ / খালি গেইল মোর ছয়মন ধান'।

জীবিকা ভিত্তিক শ্রেণি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে দেখা যায় নানান প্রবাদে — 'কামারের কাম কুমারে করে, / হাত পোড়া যায় কান্দিয়া মরে।' (কাম- কাজ, কান্দিয়া- কান্না করা) — অর্থাৎ কামারের কাজ কুমোর যেমন করতে পারে না, তেমনি কুমোরের কাজও কামার করতে অপারগ। কোনও এক শ্রেণির জীবিকার মানুষ নিজস্ব জীবিকা ব্যতীত অন্য কোন জীবিকার কাজ যথার্থভাবে করতে পারেন না। অন্যদিকে — 'কানা, টসা, ভ্যাঙ্গুর,/ তিনে হারামির নেঙ্গুর।' (অর্থ: কানা- অন্ধ, টসা- কানে কালা, ভ্যাঙ্গুর- খোড়া, নেঙ্গুর- সবচেয়ে বদমাস) — অর্থাৎ অন্ধ, কালা এবং খোড়া ব্যক্তি একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয় এবং তারা খুবই দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ হন বলে এই প্রবাদটি থেকে জানা যায়। এছাড়াও উল্লেখ করা যায়, 'কুত্তাক দিলে পিঠা পায়েস / না ছারে তার গুয়ের আয়েস।' (অর্থ: কুত্তাক- কুকুরকে, গু- মল) — অর্থাৎ কুকুর তার স্বভাব ত্যাগ করতে পারে না। যে কুকুর এক বার মলের স্বাদ পায় সেই কুকুরকে যতই

ভালো মন্দ খাবার দেওয়া হোক না কেন মল ভক্ষণ কখনোই ত্যাগ করে না। এখানে এই শ্রেণির কুকুরের চরিত্র বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে। কুকুরের স্বভাবের উপমা দিয়ে মানুষের চরিত্র বৈশিষ্ট্যর কথা তুলে ধরা হয়েছে আরোও কয়েকটি প্রবাদে: 'কুত্তার নেটুত্ ঘিউ মাখিলে / সোজা না হয় কোন্ কালে।' — কুকুরের লেজে ঘি মাখালেও তা কখনই সোজা হয় না। এখানে বলা হয়েছে এক প্রকৃতির মানুষের নিজস্ব খারাপ স্বভাব এবং চরিত্রের পরিবর্তন কখনোই ঘটানো সম্ভব নয়। বা, 'কুত্তার প্যাটোত্ ঘিউ সয় না' (অর্থ: প্যাটোত্- পেটে, ঘিউ- ঘি, সয় না- সহ্য না হওয়া) — অর্থাৎ কুকুরের পেটে ঘি সহ্য হয় না। গুন সমৃদ্ধ ভালো জিনিস সকলের সহ্য হয় না।

৪.৪ ব্যবসা-বাণিজ্য: কৃষিভিত্তিক রাজবংশী সমাজ ব্যবস্থায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাধান্য ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা না গেলেও এই সমাজের ব্যবসা বাণিজ্যের উল্লেখ প্রবাদের মধ্যে কমবেশি পাওয়া যায়। কৃষিকাজকে কেন্দ্র করে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদার ওপর ভিত্তি করে যে ব্যবসা বাণিজ্য হত তার উল্লেখ আমারা প্রবাদের মধ্যে পেয়ে থাকি। যেমন; রাজবংশী সমাজের মানুষের অতি প্রিয় পান-সুপারির ব্যবসার উল্লেখ পাওয়া যায় একটি প্রবাদে, যেখানে বলা হয়েছে ক্রোড়ে টাকা নেই অথচ দোকানে গিয়ে বড় সুপারি বাছতে শুরু করে। অপর দিকে দোকানদার গালে থাপ্পড় দিলেও দাঁত বের করে হাসতে থাকে; যথা — 'কোচাত্ নাই কড়ি ঢ্যামনা গুয়া বাচে/দোকানি মারিলেক চড় দাঁত খ্যাকটে হাসে।' (অর্থ: কোচাত্- ক্রোড়ে, কড়ি- টাকা, ঢ্যামনা- মোটা বা বড়, গুয়া- সুপাড়ি, বাচে- বাছাই করা, দোকানি- দোকানদার, দাঁত খ্যাকটে- দাঁত বার করে) — অর্থাৎ এখানে 'দোকানি' শব্দটির প্রয়োগে ব্যবসায়িক পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রাম-বাংলার অন্যতম বিপণন স্থল হল 'হাট', এই হাটের উল্লেখ রাজবংশী প্রবাদের মধ্যে একাধিকবার পেয়ে থাকি। যেমন- 'হাওয়া আছে প্যাটোত/হইড্ডা কিনিছে হাটোত্।' (অর্থ: প্যাটোত্- পেট বা উদর, হইড্ডা- রিঠা, হাটোত্- হাট) — এমনকি আরেকটি প্রবাদে পশু বিক্রির বিষয়টিরও উল্লেখ পাই, যথা- 'বাকি পাইলে হাত্তি কিনে।' (অর্থ: পাইলে- পেলে, হাত্তি- হস্তি, কিনে- ক্রয় করা) — প্রবাদটিতে বলা হয়েছে যে, বাকি পেলে মানুষ হাতির মত ব্যায় সাপেক্ষ পশুও ক্রয় করে। অর্থাৎ নগদ মূল্য ছাড়াই কোন কিছু কেনার সুযোগ পেলে মানুষ সাধ্যাতীত বস্তুও ক্রয় করে থাকে। একই রকম গবাদি পশু বিক্রয় সংক্রান্ত আরেকটি প্রবাদ হল 'গরু কিনি হাসেয়া/ টাকা নেই বাজেয়া।' — গরু কেনার সময় গরুকে হাসিয়ে কেনা উচিত, এবং টাকা নেওয়ার সময় বাজিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। এখানে গরু কেনার প্রসঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসঙ্গ এসেছে। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি হল 'পাইকার' যারা কৃষক বা বিক্রেতার কাছ থেকে সরাসরি অল্প দামে কিনে নিয়ে বাজারে মুনাফা রেখে বিক্রয় করে থাকে। এই শ্রেণির লোকেদের চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে একটি প্রবাদ হল — 'পাইকারক না কই দাদা/ গরম ভাতোত্ না খাই আদা।' — ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যেখানে লাভের মুখ দেখা যাবে সেই কাজ করার কথাও প্রবাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়; যেমন - 'যাতে হয় কড়ি/ সেই ব্যবসা ধরি।' — আবার কখনো কখনো আমরা দেখতে পাই যে মুনাফা ও আনুষাঙ্গিক খরচ সমান হয়ে থাকে তখন বলা হয় — 'লাবের গুড় পেপুরায় খায়।' — অর্থাৎ লভ্যাংশ পিঁপড়েতে খেয়ে নেয়। পক্ষান্তরে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা এটাও লক্ষ্য করি যে সারাদিন বিভিন্ন লোকের সঙ্গে অত্যধিক বাক্য-ব্যয় করে ব্যবসা করার পরও ব্যবসায় লাভ নেই। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত একটি প্রবাদ হল — 'লাভ নাই বাণিজ্যত খালি খ্যাচখচি সার ' (অর্থ: খ্যাচখচি- বকবক বা অত্যাধিক বাক্য ব্যয়, সার- শুধু)।

ভাগ্যবিড়ম্বনায় পড়ে তথাকথিত ধনবান ব্যক্তিও আর্থিক দুর্দশার শিকার হয়ে থাকে, অর্থ উপার্জনের জন্য কোন উপায়ান্তর না দেখে ভাগ্যবিড়ম্বিত ধনী ব্যক্তি ব্যবসা করে জীবন-জীবীকা নির্বাহ করে থাকে। এই রকম একটি প্রবাদ হল — 'রাজ্য গেইল্ পাট গেইল্ / গেইল্ মুকের হাসি। / নিতদারিটা ধরিয়া এলা, / দোকান করি খাচি।'

তৎকালীন রাজবংশী সমাজে নারীরা অবসর সময়ে নিজেদের ব্যবহারের জন্য 'কাঁথা' সেলাই করতেন, এমনকি সামিয়ানাও বানাতেন। রাজবংশী সংস্কৃতির এই চিত্র ফুটে উঠেছে প্রবাদের মধ্যে। যথা; 'যায় না পায় ক্যাথা

শিয়িবার/ তাঞ গেইছে সায়মানার বায়না নিবার'। এখানে 'বায়না' শব্দটি ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে বলা হয়েছে যে কাঁথা শেলাই করতে পারে না, সে নিয়েছে সামিয়ানা বানানোর বায়না। এছাড়াও বাণিজ্য করতে যাওয়ার স্পষ্ট চিত্রটিও প্রবাদের মধ্যে আমরা পাই। এরকম একটি প্রবাদ হল; 'খাবার দ্যাও দ্যাও বাণিজ্যৎ যাই। / খাইলং দাইলং এলায় যাই কি না যাই।' — প্রবাদটির প্রয়োগ যে কারণেই করা হয়ে থাক না কেন, এই মাধ্যমে বাণিজ্য বিষয়ে অবগত হওয়া যায়।

৪.৫ শিক্ষা প্রসঙ্গ: প্রবাদের প্রেক্ষিতে শিক্ষাকেন্দ্রিক আলোচনা দু'ভাবে হতে পারে; প্রবাদে শিক্ষা প্রসঙ্গের উল্লেখ এবং প্রবাদের মাধ্যমে শিক্ষা। যাইহোক, শিক্ষা যে কোন সমাজের আত্মিক শক্তিকে জাগিয়ে তোলে, মানুষের ভেতরের অন্ধকারকে মিটিয়ে আলোর দিশা দেখায়। প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থায় নিজস্ব ভঙ্গিতে পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষা প্রদান করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। সে শিক্ষা পুঁথিগত শিক্ষা হতে পারে, আবার ব্যবহারিক শিক্ষা হতে পারে, এমনকি বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত শিক্ষাও হতে পারে। রাজবংশী সমাজে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনে বহুলমাত্রায় বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয় লক্ষ্য করা যায়। রাজবংশী সমাজে পুঁথিগত শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার লক্ষ্য করা যায় বৃটিশ শাসনকালে। কোচবিহার রাজ আমলে বিদ্যায়তনিক শিক্ষার প্রচলন ঘটলেও সেসময় খুবই অল্প সংখ্যক রাজবংশী মানুষ বিদ্যায়তনিক শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছেন। পরবর্তীতে এই সমাজের মানুষদের মধ্যে বিদ্যা-শিক্ষা-চর্চার প্রসার বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। কিন্তু একথা কখনোই বলা সংগত নয় যে রাজবংশী সমাজ একসময় পুঁথিগত বিদ্যায় পারঙ্গম ছিল না বলে এই সমাজের মানুষেরা মূর্খ ছিলেন। ব্যবহারিক শিক্ষায় এই সমাজ শিক্ষিত হয়েছিল পরম্পরাগতভাবে। ঐতিহ্যগতভাবে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ব্যবহারিক শিক্ষা, জীবনে চলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার প্রবাহ বা প্রচলন হয়ে এসেছে, বর্তমানেও যার সমান প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। নারী বা পুরুষ উভয়ের মুখে মুখে প্রচলিত বিভিন্ন মৌখিক আঙ্গিক যেমন প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, ধাঁধা, লোককথা প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ্যরা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে প্রবাহিত করতেন, তাদের সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবজ্ঞান যা পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে অনেক বেশী কার্যকরী। এই সমাজের শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন মনিষী পঞ্চানন বর্মা। তিনি চেয়েছিলেন রাজবংশী সমাজের প্রতিটি মানুষ বিদ্যায়তনিক শিক্ষা এমনকি প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠুক। তিনি এই সমাজের নারীদের শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। সমগ্র রাজবংশী সমাজের মানুষদের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলে এই সমাজের সামগ্রীক উন্নয়নে তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্ঠা আজ বর্তমানে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

শিক্ষা নীতিমূলক, মূল্যবোধের জাগরণমূলক, পাপ-পূণ্য, ভালো-মন্দের বিচার সংক্রান্ত ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। শিক্ষার অভাবে মানুষ একপ্রকার অন্ধ হয়ে যায়, হোক না সে শিক্ষা পুঁথিগত কিংবা ব্যবহারিক শিক্ষা। রাজবংশী সমাজে প্রচলিত এবিষয়ক একটি প্রবাদ হল- 'চখু থাকিতে হয় কানা, / লেখাপড়া যায় জানে না।' (যায়-যে ব্যক্তি) — অর্থাৎ লেখাপড়া না জানলে চোখ থাকতেও কোন ব্যক্তি অন্ধ হয়ে থাকে। যদি কোন বিষয়ে মানুষের জ্ঞান থাকে তবেই সেই সম্পর্কিত বস্তুর গুরুত্ব অনুভব করতে সক্ষম হয়। অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান থাকে তবে সামান্য বস্তুর মধ্যেও অসাধারণত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব কিন্তু অজ্ঞানতায় মূল্যবান বস্তুও মূল্যহীন সাধারণ বস্তুতে পর্যবসিত হয়। এ সংক্রান্ত একটি প্রবাদ হল — 'চিনলে জড়ি না চিনলে খড়ি।' (অর্থ: চিনলে- চেনা বা জানলে, জড়ি- ভেষজ ঔষধি, খড়ি- লাকড়ি বা জ্বালানী)। শিক্ষা শুধুমাত্র পুঁথিগত হয় না ব্যবহারিক বা বাস্তব জীবনাভীজ্ঞতার মাধ্যমেও হয়ে থাকে, আর এই বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে — 'অধিক ঢাঙ্গা হলে বাতাসে হেলায় / অধিক খাটো হলে ব্যাঙও ন্যাদায়।' (অর্থ: অধিক- অত্যাধিক, ঢাঙ্গা- লম্বা, হেলায়- নুইয়ে দেওয়া, ন্যাদায়- লাথি দেওয়া) — অর্থাৎ অত্যাধিক লম্বা হলে হাওয়াতে ফেলে দিতে পারে, আর বেশি ছোট হলে ব্যাঙও লাথি মারে। আলোচ্য প্রবাদটির অভ্যন্তরে গূঢ় অর্থ লুকিয়ে আছে, আর তা হল অত্যাধিক কোন কিছুই ভালো নয়, ঠিক যেমন অত্যাধিক অহংকারী হলে মানুষ ঘৃণা করে, আবার তার উল্টো দিকে অত্যাধিক নম্র হলে মানুষ অবহেলা করে থাকে। মানুষ যথাযথ উপার্জন করেও বাস্তবতবোধের অভাবে দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে থাকে। এই অবস্থার সম্মুখীন যাতে না হতে হয় এই সংক্রান্ত একটি

শিক্ষামূলক প্রবাদ হল — 'অলপে পোষে ফাইকে চোষে।' (অর্থ: অল্পে- অল্পপরিমাণে, পোষে- প্রতিপালন, ফাইকে- অত্যাধিক, চোষে- ধ্বংষ করা বা শোষণ করে) — উপার্জন অল্প হলে যদি হিসেব করে ব্যয় করা হয়, তাহলে সংসার ভালোভাবে প্রতিপালন সম্ভব। পক্ষান্তরে যদি অর্থের প্রাচুর্য্য থাকে সেক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খলতার কারণে অর্থের বিনাস ঘটে।

জীবনে উন্নতি করতে গেলে প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলতে হয় ধাপে ধাপে। যার উল্লেখ মেলে এই প্রবাদটিতে — 'আগোত্ দ্যাও সিড়ীত্ পাও/ পড়ে সেনে উপরাত্ যাও।' (অর্থ: আগোত্- আগে, দ্যাও- দেওয়া, পাও- পা, পরে সেনে- পরবর্তীকালে, উপরাত্- ওপরে, যাও- যাওয়া) — উপরে উঠতে হলে আগে সিঁড়িতে পা দেওয়া প্রয়োজন। ঠিক এর উল্টোদিকে সময়ানুযায়ী কোন কাজ না করলে তার পরিণাম বিধ্বংষী হয়ে থাকে — 'অকালোত বাড়ে সকালোত মরে।' (অর্থ: অকালোত- অসময়ে, বাড়ে- বৃদ্ধি পাওয়া, সকালোত- সকাল বেলা এখানে তাড়াতাড়ি অর্থে ব্যবহৃত) — অর্থাৎ যথা সময়ের পূর্বেই যদি কেউ বৃদ্ধি পায়, তবে সময়ের আগেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। কোন দেশের নাগরিক যদি অন্ধ হয়, তথাপি কোন বৃহৎ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যদি দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা অন্ধ অর্থাৎ অজ্ঞানী হয়ে থাকে, তবে সেই দেশের সমূহ বিপদ। যথা; 'চখু কানা হওয়া ভাল/ কিন্তু দ্যাশ কানা হওয়া কাল।' (অর্থ: চখু- চোখ, কানা- অন্ধ, ভাল- ভালো, দ্যাশ- দেশ, কাল- খারাপ) — চোখ অন্ধ হলে কোন অসুবিধা নেই কিন্তু যদি দেশ অন্ধ হয়ে থাকে তবে সমূহ বিপদ ঘটে থাকে।

ভুলের মধ্য দিয়েই মানুষ প্রকৃত শিক্ষা লাভ করে এবং সেই শিক্ষা চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। এই বক্তব্যের সপক্ষে একটি রাজবংশী প্রবাদ হল — 'বাপই তুই শিকিলু কোটে/ চাচা ঠেকিলুং যেটে।' — শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য নির্দিষ্ট বয়সের সীমা রেখার কথা বলা হয়েছে। কারণ যে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করার পেছনে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি জীবন যাপনের জন্য অর্থ উপার্জন করার উদ্দেশ্য বিদ্যমান। এই বক্তব্যের সাপেক্ষে উল্লেখনীয় প্রবাদটি হল- 'বিশে বিদ্যা তিরিশে ধন/ তার ওপাখে ঠন ঠন।' — কুড়ি বছরে বিদ্যা অর্জন করতে হয় এবং তিরিশ বছরে ধন অর্জন করতে শুরু করতে হয়, নইলে পরবর্তীকালে আর কিছু করার থাকে না। এককথায় সময়ের কাজ সময়মত না করলে জীবনে কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন বিনম্র হয়ে গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করা। যার উল্লেখ এই প্রবাদটিতে পাওয়া যায়- 'বড় হবার চাইস তো ছোট হ।' — অর্থাৎ বড় হতে চাইলে আগে ছোট হওয়া প্রয়োজন।

বিদ্যায়তনিক শিক্ষা লাভ করতে গিয়ে আমরা চিরায়ত ধ্যান-ধারণাকে সরিয়ে তথাকথিত শিষ্ঠভাষার ব্যবহার ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে শুরু করি। বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে — 'নুনক কয় লবন, ত্যালোক কয় তৈল / হামার ছাওয়াটাক ইসকুলোত দিয়া হ্যান্তন ক্যানে হৈল।' — এখানে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত নিজস্ব শব্দের পরিবর্তে তথাকথিত শিষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ করায় ব্যবহারকারীকে ব্যাঙ্গের সুরে তীর্যক কথা শোনানো হয়েছে। বেদ উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্র পড়ে শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া সম্ভব কিন্তু প্রকৃত সন্যাস লাভ অর্থাৎ একাগ্র চিত্তে ঈশ্বর সাধনার মাধ্যমেই ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব। যেমন; 'বেদ বিধি পড়িয়া শাস্ত্রের পাঁও ঠাঞি। / বিনা সন্যাস না হলে তোর ভাণ্ডের নিস্তার নাই।' — শাস্ত্রপাঠে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসঙ্গের উল্লেখ এখানে লক্ষ্য করা যায়।

৪.৬ নগরায়ণ ও তৎকালীন নগরজীবন: মৌখিক সাহিত্যের পরিসরে প্রবাদের মধ্যে কোন সমাজের নগরায়ণ ও তৎকালীন সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্ট রূপে লক্ষিত হয়। নাগরিক সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানব সমাজের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যার উল্লেখ প্রবাদের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। সময় পরিবর্তিত হয়, পূর্বের অবস্থা পরিবর্তন হয়, এক সময়ের বিত্তশালী ব্যক্তির অর্থনৈতিকভাবে অবনতির ফলে দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম অঙ্গ 'পান-সুপারি'র ওপরেও তার প্রভাব পড়ে। 'এ্যালা কি আর সেই দিন আছে/ এক খিলি পান এ্যালা তিন দিন যাসে।' (এ্যালা-এখন, সেই-সেরকম, যাসে-যাচ্ছে) — প্রবাদটিতে উল্লিখিত এক খিলি পান এক গ্রাসেই শেষ হয় কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তা তিন ধরে খেতে বাধ্য হন। সময় পরিবর্তিত হয় এবং মানুষের অবস্থারও পরিবর্তন হয় সে কারণেই এক সময় স্বচ্ছল অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। সমাজ জীবনের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আর

এই পরিবর্তনের ফলে বলা যায় 'আগের দিন নাইরে নাথ / চুরা খাইতে ভাঙ্গে দাঁত।' (নাইরে- নেই, নাথ- সম্মোধন, চুরা- চিড়ে, খাইতে- খেতে, ভাঙ্গে- ভেঙ্গে যায়) — অর্থাৎ আগের মতো দিন নেই, এখন চিঁড়ে খেতে দাঁত ভেঙ্গে যায়। এই প্রবাদটিতে একদিকে বার্ধক্যজনীত অবস্থার চিত্র ফুটে ওঠে, অন্যদিকে তেমনি সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের চিত্রটিও প্রকাশিত। পূর্বে চিঁড়ে ভাঙ্গানো হত ঢেঁকিতে অথবা উরুনে, সেই চিড়ে নরম এবং সুস্বাদু ছিল। বর্তমানে চিঁড়ে মেশিনে ভাঙ্গানো হয় এবং সেই চিঁড়ে তুলনায় শক্ত হয়ে থাকে। নগরায়ণের ফলস্বরূপ পূর্বের সেই রীতির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নগরায়ণের ফলে মানুষের জীবন শৈলী যেমন পরিবর্তীত হয়, তেমনি খাদ্যাভাসেরও পরিবর্তন হয়, এই পরিবর্তন প্রবাদের মধ্যে জীবন্ত থেকে গেছে — 'আগের নাখান খাওয়ারও নাই, / আগের নাখান মানসিও নাই।' (আগের- পুর্বের, নাখান- মতন, মানসিও- মানুষও, নাই- নেই) — অর্থাৎ পূর্বের মত খাবারও নেই এবং পূর্বের মত মানুষও নেই। এখানে সময় এবং সমাজের পরিবর্তনের চিত্রটি ফুটে উঠেছে।

তৎকালীন নগরজীবন প্রসঙ্গে একটি প্রবাদের উল্লেখ করতেই হয় — 'ফ্যানা মাখা ভাত খায়, গল্‌ফ মারে দৈ, / ফাকা হুকাত্‌ তামুক খায় গড় গড়াটা কৈ।' (ফ্যানা মাখা ভাত- ফ্যান যুক্ত ভাত, গল্‌ফ মারে- গল্প দেয় বা বলে, দৈ- দই, তামুক- তামাক, গড় গড়াটা- গুড়গুড়ি টানার নল, কৈ- কোথায়) — এর অর্থ হল, ফ্যান ভাত খেয়ে দৈ খাওয়ার গল্প করে এবং ফাকা হুকায় তামাক খেয়ে গুরগুরি খোঁজে। অর্থাৎ প্রবাদটিতে তৎকালীন রাজবংশী সমাজে বহূলভাবে তামাকপাতার চাষ করা হত এবং নেশা হিসেবে এর সেবন করার বিষয়টি সম্পর্কে জানা যায়।

কৃষিনির্ভর সহজ সরল জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত রাজবংশী সমাজেও পরিবর্তন এসেছে জীবনযাত্রায়। পরিবর্তন হয়েছে রাজবংশী নারীর অঙ্গসজ্জার, অলংকারের। কখনো কখনো এই পরিবর্তন সাদরে গৃহীত হয়েছে, আবার কখনো তা ব্যঙ্গের তীরে বিদ্ধ হয়েছে। ঠিক এরকমই নারীর সাজসজ্জার পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরে এমন একটি প্রবাদ হল — 'আজি কালির চ্যাংড়ী গিলার নম্বা নম্বা চুল, / মাথাত্‌ বান্দে নাইলনের ফিতা, / কানোত্‌ পেন্দে দুল।' (আজি কালির- আজ কালের, চ্যাংড়ীগিলার- মেয়েদের, নম্বা নম্বা- লম্বা লম্বা, মাথাত্‌- মাথায়, বান্ধে- বাঁধা, নাইলনের ফিতা- লাইলন সুতোর ফিতে, কানোত্‌- কানে, পেন্দে- পড়ে, দুল- কানের অলংকার) — প্রবাদটিতে উল্লিখিত 'নাইলনের ফিতা' নগরায়ন বা আধুনিকতার প্রবেশের পরিচায়ক। শিল্পবিপ্লবের ফলে গ্রামের নর-নারীর কাছেও আধুনিক তৈজসপত্র, এমনকি নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যাদি হাতের নাগালের মধ্যে চলে আসে, আর তারই একটুকরো চিত্র এর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে বসবাসকারী মানুষদের প্রাকৃতিকভাবে বিভিন্ন প্রতিকুলতার মধ্যদিয়ে জীবনযাপন করতে হত। বর্তমানে এই সমস্যার অনেকাংশে সমাধান হয়েছে কিন্তু একসময় কালবৈশাখী ঝড় এমনকি নদ-নদী পরিপূর্ণ অঞ্চলগুলিকে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়তে হত। নদী মাতৃক দেশ হওয়ায় বন্যার প্রকোপে প্রতি বছর ঘড় বাড়ি ডুবে যেত। এই ভয়াবহ জীবনাভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ যে প্রবাদটি ব্যক্ত করা হয়েছে সেটি হল — 'এমন ঘড় বান্দি, / ছাড়ি গেইলে না কান্দি।' (বান্দি- বাঁধা, ছাড়ি- ছেড়ে যাওয়া, গেইলে- গেলে, না কান্দি- কান্না করি না) — এমন ঘর বানাবো যে ছেড়ে গেলেও যাতে কষ্ট না হয়।

সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন যুগে যুগে ঘটে থাকে। প্রচলিত আছে যে — সত্য, দ্বাপর ও ত্রেতা যুগের পরবর্তীতে কলি যুগ এসেছে। বর্তমান কাল কলিকাল। বলা হয়, এই যুগে মানুষ নৈতিকতা ও বিবেকবোধ হারিয়ে ফেলবে চূরান্তভাবে। এর ফলে সন্তান পিতা-মাতা গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে ফেলে। এক্ষেত্রে এই প্রবাদটি উল্লেখনীয় — 'কলি কালের নয়া চাল, / বাপক কয় হুকাটা আন।' (কলি কালের- কলি যুগের, নয়া- নতুন, চাল- রীতি বা ধরন, বাপক- বাবাকে, কয়- বলে, হুকা- হুকো, আন- আনা বা নিয়ে আসা) — এখানে সন্তান তার পিতাকে নির্দেশ দেয় তার জন্য নেশার বস্তু হুকা নিয়ে আসার জন্য। যা সর্বোতভাবে সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্রটিকে তুলে ধরে। এরকম আর একটি প্রবাদ হল- 'কলি কাল, মন্দ কাল, কলির সাত ভাও, / যুয়ান বেটা না পোষে বুড়া বাপ মাও।'

রাজবংশীরা যে এলাকায় বসবাস করে আসছেন বা যে এলাকার ভূমিপুত্র সেই অঞ্চল এক সময় 'রাজ শাসনাধীন' ছিল। রাজার শাসনাধীনে রাজার পাইক, সৈন্য, বরকন্দাজ, নায়েব প্রভৃতি পদাধীকারীর উপস্থিতি থাকা স্বাবাভিক সেই সঙ্গে এই সকল মানুষের প্রতি ভয় ভীতি থাকাও স্বাভাবিক। এই পরিস্থিতির প্রকাশকারী প্রবাদটি হল- 'ভার ভাট্টি দেকিলে কয় মুই মোড়লের মাও, / পাইক পেয়াদা দেকিলে কয় ছান ফ্যালের যাও। ' — অর্থাৎ ভাল ভাল জিনিস দেখলে লোভ সামলাতে না পেরে বলে আমি এবাড়ির মালিক কিন্তু পাইক বরকন্দাজ দেখলে বলে আমি নিস্ব ব্যক্তি, এবাড়ির কেউ নই। প্রবাদটি পরিবারের কোন লোভী ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ করে বলা হলেও, প্রবাদটি সেই সময়ের তৎকালীন সামাজিক চিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। ভয়ের পাশাপাশি আবার একই সঙ্গে আরেকটি বিপরিত চিত্র ফুটে ওঠে একটি প্রবাদে যেখানে শ্রেষ্ঠ বস্তুর উদাহরণ দিতে গিয়ে সিপাহির ঘোরার উল্লেখ আছে। যেমন ; 'চন চনা বাঁশের ঝন ঝনা ঝিক। / বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া।' — তৎকালীন সমাজে রাজ প্রভাব কতটা গভীরভাবে ছিল তা আমরা বুঝতে পারি এই সমাজে প্রচলিত প্রবাদগুলিতে রাজার উল্লেখ প্রসঙ্গে। রাজ্য এবং রাজার প্রসঙ্গ উল্লেখকারী এরকম প্রবাদগুলি হল — 'রাইজ্য যায় বসিয়া খালে, / কাজ কইরলে ভাত মিলে।' বা 'রাজা গেইচে সোয়ারী উদাম হইচে কোয়ারী।' (গেইচে-গিয়েছে, সোয়ারী-অশ্বারোহণে নগরান্তে গমন, উদাম-খোলা/মুক্ত, কোয়ারী- দরজা/কোষাগার) — 'রাজার নাও কড়ি, মরার নাও খড়ি।' — অর্থাৎ রাজ সাক্ষাতে গেলে উপঢৌকন নিয়ে যাওয়া আবশ্যিক তেমনি মৃত ব্যক্তির জন্য খড়ির প্রয়োজন।

সমাজ পরিবর্তিত হয়, আর তার সাথে মানুষের মানষিকতা। সেই সঙ্গে আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণারও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যে সকল মানুষ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন না, তারা পিছিয়ে পড়েন তথাকথিত সমাজের নিরিখে। একসময় যারা জোতদার বা জমিদার বা অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন তারা তাদের সম্পত্তির গরিমায় গৌরবান্বিত ছিলেন, কিন্তু দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার পর ভারত সরকার জমিদার, জোতদারদের জমি অধিগ্রহণ করে নেওয়ার ফলে, সেই সকল তথাকথিত অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা নিজেদের সম্পত্তি হারিয়ে ফেললেও আত্মগরিমা ভুলতে না পারায় পূর্বের মতই জীবন-যাপন করতে থাকে। যার ফলস্বরূপ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমাগত দীন-হীন হতে থাকে। পক্ষান্তরে সেই সকল আর্থিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অধঃস্তন আধিয়ার বা কৃষকেরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে স্বীকার করে নিজেদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করে যায়। এই পরিস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায় এমন একটি প্রবাদ হল — 'ভাল ভাল গিরস্থের ছাওয়া পরিয়া হবে হীন, / হাট সামটা ন্যাদাই চোত্তা তারে হবে দিন। ' — অর্থাৎ আজ যারা স্বচ্ছল অবস্থায় আছে তারা পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে দূর্বল হয়ে পড়বে, পরিবর্তে পরিবর্তনের ঢেউয়ে সমাজের অবহেলিত মানুষগুলি নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে সমাজকে শাসন করেবে।

তৎকালীন সমাজের ইউনিয়ন বোর্ড-এর বিষয়ে একটি রাজবংশী প্রবাদের বিচার ব্যাবস্থার চিত্রটি উঠে আসে। যথা; 'কলির বিচার ছেই, / বেঞ্চে বোর্ডে দেখির পাই / নেকাপড়া না জানে কাঁহ তারে মাতাত বড়।' — অর্থাৎ কলিযুগে যথাযোগ্য বিচার পাওয়ার কোন আশা নেই, কারণ যারা বিচার ব্যবস্থার প্রতিনিধি বা রক্ষক, তারা কেউ লেখাপড়া জানত না অথচ বড় বড় পদ বা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বসে থাকত। এই ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যেত তৎকালীন ইউনিয়ন বোর্ডে।

তৎকালে পুলিশি ব্যবস্থার প্রতি মানুষের ভরসা-হীনতার চিত্রটি উঠে আসে এই প্রবাদে — 'মুরগীক্ না কই পকি/ পুলিশক্ না কই সখি।' — এখানে বলা হয়েছে মুরগী পাখি হলেও সে কখনো বুলি ধরে না বা শেখে না, সে তার নিজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কর্কশ স্বরে ডাকে। ঠিক তেমনি পুলিশ যতই বন্ধু হোক না কেন তাকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই কারণ পুলিশ তার স্বভাবকে বা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে ত্যাগ করতে পারে না বা ভুলে যেতে পারে না।
গভীরভাবে অন্বেষণ করলে সমকালীন সমাজচিত্র ও নগরায়নের নানান চিত্রের প্রসঙ্গ সম্বলিত বহু প্রবাদের খোঁজ পাওয়া সম্ভব।

৪.৭ নারীর সামাজিক অবস্থান: নারী বন্দনা ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ বিশেষত্বের দিক। রাজবংশী সমাজ এর ব্যতিক্রম নয়। নারী সমাজকে বিশেষ উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত করে থাকে রাজবংশীরা। নারী বন্দনা বিশেষত মাতৃ-বন্দনা সম্বলিত বহুল প্রবাদের উল্লেখ বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থে পাওয়া যায়। মা যে কি পরম ধন তা যার নেই সেই বোঝে বা যে মাকে হারিয়েছে সেই উপলব্ধি করে। 'থাকুক না ক্যানে মেলা গুষ্টি / নিজের মাও না থাইকলে না হয় তুষ্টি' — অর্থাৎ অনেক আত্মীয় পরিজন থাকলেও, নিজের মা না থাকলে কখনো সন্তানের যত্ন হয় না। সন্তানের এই আর্তনাদ যেন সমগ্র নারী জাতির প্রতিই বর্তায়।

তবে শুধুমাত্র নারী বন্দনা নয়, নারীকে হেয় প্রতিপন্ন হতেও দেখা যায় সমাজের নানা স্তরে; যার উল্লেখও রাজবংশী প্রবাদে রয়েছে। যেমন; 'দুধ মিঠা, চিনি মিঠা আরও মিঠা ননী / সউগ চাইতে অধিক মিঠা মাও বড় জননী।' — অর্থাৎ পুত্রের কাছে মায়ের তুল্য শ্রেষ্ঠ কিছু নেই। মাতৃহীন পুত্রই মায়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। এই 'মা' কারোর মা, কারো স্ত্রী, কারোও শাশুড়ি — সমাজে বহুবিধ ভূমিকায় তাঁকে দেখা যায়। ফলে, সমাজে বহুমাত্রিক রূপে মা বর্তমান। প্রত্যেক ক্ষেত্রবিশেষে সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী মা'কে নিয়ে প্রবাদের উল্লেখ পাওয়া যেতে পারে। যেমন, 'ঐদৎ পোড়ং জলৎ ভিজং / মোর শরীলে তাবৎ সয় / তোমার কিন্তুক সর্দি কাশি / মাথা বিষিবার ভয় / মিহি চাউলের ভাত কনেক মাচের ঝোল / তেঁও শোনং দিনাও দিনাও তোমার প্যাটের গণ্ডগোল।' — বিশিষ্ট রাজবংশী প্রবাদ বিশ্লেষক অরবিন্দ ডাকুয়ার মতে, স্বামী অসুস্থতার কারণে স্ত্রী রোদ, বৃষ্টি, ঝড়কে উপেক্ষা করে সমস্ত কাজ করে শুধুমাএ স্বামীকে সুস্থ রাখবার জন্য। তথাপি স্বামীকে সুস্থ রাখতে পারে না। এই ক্ষেদোক্তি স্বামীর প্রতি স্ত্রীর। পতি পরায়ণতা বা দায়িত্বশীল স্ত্রী হিসাবে স্বামীর প্রতি কর্তব্যবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য প্রবাদে। স্ত্রী আত্মগত খেদোক্তি তার কর্তব্যপরায়ণতা কে উল্লেখ করেছে।

একটি অতি বাস্তব কথা রাজবংশী প্রবাদে প্রচলিত আছে — 'এ্যালায় হামার মাই **চ্যাং** মাচে না খায়, / ভাতার মইরলে মাই চ্যং মাচে না পায়।'— অর্থাৎ স্বামীর গৌরবে গৌরবান্বিত কিন্তু সেই স্বামীর মৃত্যুর পর দুঃখের শেষ থাকে না। বিবাহ উপযুক্ত কন্যাকে উপযুক্ত ছেলে নির্বাচন করে বিয়ে দেওয়া যে কোনো বাবার কর্তব্য। এই কর্তব্যবোধে অবহেলা হলেই বাবাকে সইতে হয় অপমান। এমনই এক কন্টেক্স ধরা রয়েছে রাজবংশী প্রবাদে — 'কতা কইলে বাড়ে কতা,/ জলত্ বাড়ে ধান / বাপের ঘরত থাইকলে কইন্যা / বাপের অপমান।' — অরবিন্দ ডাকুয়ার মতে, কথা যত বেশি বলা যাবে সংসারে ততই বেশি অশান্তি বাড়বে। পিতার ঘরে বিবাহযোগ্য মেয়ে থাকলে বাপ মায়ের চিন্তার কারণ হয়ে থাকে। বর্তমান প্রবাদটিতে স্পষ্ট যে, কন্যা সন্তানের সর্বত্র বিড়ম্বনা। পিতার কাছে বেশি বয়স পর্যন্ত থাকলে পিতা-মাতার অপমানের কারণ হয়ে থাকে। কি অদ্ভুত বি**ড়**ম্বনা! এমন ধরনের আরোও একটি প্রবাদের নিদর্শন তুলে ধরা যেতে পারে — 'বেটি পোষা বড় দোষ, / উব্জি বেটি পরার পোষ।' (বেটি- মেয়ে, পোষা- পালন করা, উব্জি- জন্মগ্রহণ করা, পরার- অপরের, পোষ- পালিত) কন্যা সন্তানের জন্মের পর তার লালন-পালন করে তার অন্য পরিবারে বিবাহ দেওয়াই রীতি। অর্থাৎ কন্যা সন্তানের জন্মই হয় অন্যের ঘরে বিয়ে দেবার জন্য।

নারীর সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী কখনও না কখনো কারোর না কারোও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। শৈশবস্থায় থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত কন্যা বাবার মুখাপেক্ষী, বিয়ের পর স্বামীর কিংবা স্বামী বার্ধক্য বা গত হলে তখন সন্তানের মুখাপেক্ষী — মূলত এভাবেই নারীকে তার জীবন অতিবাহিত করতে হয়। আর এই আশ্রয়স্থল গুলি হারিয়ে গেলে বা এঁরা অবহেলা করলে সেই নারীর করুণ দশা উপস্থিত হয়। আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী এই কাঠামোতেই বাঁধা — একথা বললে অতুক্তি হয়না। এমনই চিত্র ধরা পড়েছে একটি প্রবাদে — 'আকাশোত্ নাইরে চন্দ্র কিবা করে তারা / যে নারীর সোয়ামী নাই জিয়ন্তে মরা।' (আকাশোত্- আকাশে, নাইরে- নেই, কিবা- কি, সোয়ামী- স্বামী, জিয়ন্তে- জীবিত অবস্থায়) — অর্থাৎ আকাশে চাঁদ নেই তারা কি করবে, আর যে নারীর স্বামী নেই সে জীবন্ত অবস্থায় মরা। অর্থাৎ স্বামী না থাকলে সমাজে সেই নারীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে থাকে।

সমাজ কাঠামোই স্টিরিওটাইপ একটা ধারণা, সাংসারিক কাজের মধ্যে ঘর সামলানোর মত কাজগুলি মূলত নারীদের দেখতে হয়। এ নিয়ে নারীর ক্ষেদোক্তি শোনা যায় প্রবাদে — 'কপালোত্ আছে বান্দি গিরি, / খালি কান্দিয়া করিবু কি?' — (কপালোত্- কপালে বা ভাগ্যে, বান্দি গিরি- পরিচারিকা, খালি- শুধু, কান্দিয়া- কেঁদে, করিবু কি- করবে কি) — কপালে যদি পরিচারিকার কর্ম লেখা থাকে তাহলে কেঁদে আর কি করব?

অর্থাৎ আমরা লক্ষ্য করেছি লিঙ্গগত পার্থক্য ও অর্থনৈতিক সামাজিক বিন্যাসের কারণে নারী-পুরুষের মধ্যে একটা আড়াআড়ি যে ভেদ-রেখা রয়েছে তা প্রবাদ বিশ্লেষণে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। পাশাপাশি, প্রবাদের পাঠ-বিশ্লেষণে নারীসত্ত্বার সমাজমনঃস্তত্ত্ব সম্পন্নভাবে ধরা পড়ে। আর এতেই পরিস্কার হয়ে যায় রাজবংশী সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থান ক্ষেত্র। বেশকিছু রাজবংশী প্রবাদের পাঠ-বিশ্লেষণ করে সমাজে নারীর অবস্থান ক্ষেত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হল মাত্র।

৪.৮ দেবদেবীর চরিত্র নির্মাণে সমাজ বাস্তবতার প্রতিফলন: প্রায় প্রত্যেক সমাজ মানুষের মনে ধর্ম এবং ঐশ্বরিক চেতনা তাদের নিজের নিজের ধারণানুযায়ী প্রভাব বিস্তার করে থাকে। রাজবংশী সমাজের মানুষেরাও ধর্মপ্রাণ এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসী। বিশ্বাসের এই প্রতিফলন সমাজে প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে বহুল পরিমানে লক্ষ্য করা যায়। কখনো আচার-আচরণের শুদ্ধতা, নিষ্ঠা, বিবেক চেতনাবোধ এমনকি নিয়ম-নীতি, জ্ঞান দান করা হয়েছে বিভিন্ন দেবদেবীর চরিত্রের আড়ালে। আবার কখনো আচার, সংস্কারের পালন না করায় দেখানো হয়েছে দেবদেবীদের প্রোকপে সমূহ ক্ষতির ভয়। আবার কখনো দেবদেবীর রোষে নিজেদের জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি কিংবা দুর্ভাগ্যেরও উল্লেখ প্রবাদে পেয়ে থাকি। জীবনের বিভিন্ন দিক প্রকাশ করতে দেব-দেবীর উল্লেখ প্রবাদে স্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয়। যেমন; 'কপালের লেখা না যায় খণ্ডিয়া / যেঠে যায় চন্দ্রাবলী সেঠে যায় কটিয়া।' (কপালের লেখা- ভাগ্য লিপি, খণ্ডিয়া- খণ্ডন করা, যেঠে- যেখানে, চন্দ্রাবলী- রাধা এখানে রাজকুমারী, সেঠে- সেখানে, কটিয়া- প্রেমিক) — ভাগ্য-লিপিকে কখনো খণ্ডন করা যায় না, যেখানে চন্দ্রাবলী যায় সেখানেই তার প্রেমিকও যায়। এই বক্তব্যের রূপকার্থে বলা হয়েছে যে, মানুষ যতই তার দুঃখ কষ্ট থেকে দূরে যেতে বা এড়িয়ে যেতে চাক না কেনো, কখনোই সে নির্ধারিত দুঃখ-ভোগ এড়াতে পারে না। আমরা ঈশ্বরকে সেই রূপেই পেয়ে থাকি যে রূপে আমরা তাকে কল্পনা করে থাকি। যথা; 'কৃষ্ণ ক্যামন, যার মন যেমন।' — পিতা-মাতা এবং শিক্ষাগুরু - এই ত্রয়ী আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিন জন ব্যক্তি। মনে করা হয় এই তিন ব্যক্তি জীবনের জীবন্ত ঈশ্বর, এদের দেখানো পথে চালিত হলে আমাদের জীবনে বাধা-বিঘ্নকে আমরা অতি সহজেই জয় করতে সক্ষম। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি গুরুকে ছেড়ে যে গোবিন্দ ভজনা করে, গোবিন্দ তাকে ত্যাগ করে — 'গুরুক ছাড়ি গোবিন্দক ভজে / গোবিন্দ তাক্ সদায় ত্যাজে।' (গুরুক- গুরুকে, ছাড়ি- ছেরে বা বাদ দিয়ে, তাক্- তাকে, সদায়- সবসময়, ত্যাজে- ত্যাগ করে) — অর্থাৎ যিনি সম্মুখে আছেন তাকে অবজ্ঞা করে যখন দূরবর্তী কারোর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা হয়, তখন এই প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়। প্রবাদ বাক্যটিতে গোবিন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কথা প্রসঙ্গে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আবার কখনো বাহ্যিক মেকি আড়ম্বরের প্রসঙ্গে কটাক্ষপাত করার সময়েও ঈশ্বরের প্রসঙ্গকে তুলে ধরা হয়ে থাকে। যেমন; 'গোয়াত নাই চাম / হরে কিষ্টোর নাম।' (গোয়াত- গায়ে, নাই- নেই, চাম- চামরা, কিষ্টোর- কৃষ্ণের)। একই রকমভাবে কোন ব্যক্তির আচরণের প্রতি তাচ্ছিল্যার্থে যে প্রবাদবাক্য ব্যবহৃত হয়তো হল — 'ঢকের সাইটোর।' (ঢকের- ঢং এর বা নানা রকমের আকৃতির, সাইটোর- দেবী পদ্মার প্রতিকৃতি সম্বলিত সুদর্শন ঝাড় বিশেষ বা দেবী পদ্মার প্রতিকৃতি চিত্র বিশেষ) —এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, রাজবংশী সমাজে সাইটোর বিষহরি হলেন একজন প্রধানা দেবী। এই দেবী সর্পকূলের দেবী। জল-জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলে দেবী বিষহরি বা দেবী মনসা সকল রাজবংশী মানুষের কাছে যেমন ভয়ের দেবী, তেমনি যেন খুব কাছের একজন, যার উপস্থিতিতে বা যার আশীর্বাদে তাদের জীবনের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা মিটে যায়। আর তাই যেন প্রবাদের মধ্যে নানা প্রসঙ্গে বার বার ফিরে আসে দেবি পদ্মা বা বিষহরি বা দেবী মনসার উল্লেখ। এই রকম কয়েকটি প্রবাদ হল — 'পুখুরিত তো পানি নাই পদ্মা ক্যানে হাসে, / ঠাকুর বাড়িত ত কানাই নাই গোপী ক্যানে হাসে।' আবার- 'ডাংধরি মাও আইসেছে ঐ নদীর

ওর, / জ্বর জ্বারি কতা শুনে কষে নাগায় দৌড়।' — এই প্রবাদটিতে দেবী পদ্মাকে রাজবংশীরা ভালোবেসে কাছের করে নিয়ে 'ডাংধরি মাও' বলে সম্বোধন করেছে। এখানে বলা হয়েছে 'ডাংধরি মাও' আসছে দেখে জ্বর সহ বিভিন্ন শারিরীক অসুস্থতা দ্রুত পালিয়ে যায়।

যে ব্যক্তি উপার্জনে অক্ষম বা অসমর্থ সেই ব্যক্তি অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন দেবতার সাহায্যের প্রত্যাশী হয়ে পড়ে জীবনে। এই ধরনের মানুষের প্রতি বিদ্রুপার্থে যে প্রবাদ উচ্চারিত হয়ে থাকে তা হল: 'আর্জিয়া খাবার না পায়, / ছোব ছুন্নী ধরি বেড়ায়।' (আর্জিয়া- উপার্জন করে, খাবার না পায়- খেতে পারে না, ছোব ছুন্নি- অলৌকিক দেবতা, ধরি-নিয়ে, বেড়ায়- ঘোরা)।

দেবী লক্ষ্মী অর্থ, যশ, সম্পত্তি, সমৃদ্ধির দেবী। এই দেবীকে প্রায় প্রত্যেক সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে থাকেন। রাজবংশী সমাজে প্রচলিত প্রবাদে বার বার এই দেবীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। কখনো অনাচার করলে দেবী লক্ষ্মীর গৃহস্থ বাড়িকে ত্যাগ করার প্রসঙ্গ বলা হয়েছে, আবার কখনো দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদের কথা বলা হয়েছে। যথা: 'উচিত কতা কইলে দোস্ত ব্যাজার হয়, / বড় গাসে খাইলে লক্ষ্মী ছাড়া হয়।' (উচিত কতা- সঠিক কথা বা সত্য কথা বা ন্যায্য কথা, কইলে- বললে, দোস্ত- বন্ধু, ব্যাজার- বিমুখ বা অপ্রসন্ন, গাসে- গ্রাসে), অথবা 'আইসে লক্ষী যায় বালাই।' — এখানে দেবি লক্ষ্মীর আগমনে অশুভ শক্তির বিনাসের কথা বলা হয়েছে। দিনের বেলায় কলহ করে সন্ধ্যা বেলায় ধান ভানলে সেখানে এই দেবী যেতে চান না — 'দুপুরি ক্যাচাল সন্ধ্যা বাড়া, / লক্ষী কয় মুই না জাং ও পাড়া।' — প্রবাদটি দেবী লক্ষ্মীর প্রসঙ্গে যে অন্তর্নিহিত বক্তব্যটি প্রকাশ করে তা হল যে, কলহ করা এবং সময়ের কাজ যথা সময়ে না করলে অর্থ, সমৃদ্ধি, স্বচ্ছলতা সেখান থেকে দূরে চলে যায়, নেমে আসে দুঃখ-দুর্দশা। একই রকম ভাব প্রকাশকারী আরেকটি প্রবাদ হল — 'বাড়ির গীথানি যদি সানঝত্ ভানে বাড়া,/ বাঁশের তলত্ কান্দে লক্ষী না যায় হাবাতি পাড়া।' — কর্ম না করলে ব্যক্তি কখনোই তার লক্ষ্যে পৌছোতে পারে না। স্বয়ং দেবীও দিতে পারবেন না বা দেবেন না। যথা; 'যদি হয় আলসিয়া / স্বয়ং লক্ষী মাতা নাদিবে ভাত মুখোৎ ডুবিয়া।' অথবা 'মাও লক্ষি দিলেক বর,/ চাউল কাড়ি ঘর কর /চাউল দিয়া না দিলেক কড়ি / তাকে করিম মুই নারি ঝুরি।'

রাজবংশী সমাজে উপদেবতা বা অপদেবতার প্রভাব ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই সকল অপদেবতা বা উপদেবতার মধ্যে 'মাসান দ্যাও' অন্যতম। রাজবংশীরা বিশ্বাস করেন 'মাসান দ্যাও' এর পুজা দিলে এবং তাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে কোন প্রকার শারিরীক ব্যাধি বা বিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং মাসান দ্যাও তাদের খারাপ ব্যাধি থেকে রক্ষা করেন। প্রবাদের মধ্যেও বার বার এই দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা; 'মাসান চায় ভাজা ভুজা, তাক্ দুদ্ কলা দিলে কি হবে?' — এই প্রবাদটিতে বলা হয়েছে যে, মাসান ঠাকুর ভাজা, পোড়া পেলেই সন্তুষ্ট হন কিন্তু তার পরিবর্তে তাকে যদি দুধ কলা দেওয়া হয় তাহলে তিনি সন্তুষ্ট তো হবেন না উপরন্তু তার কোপে পড়ার আশঙ্কা থাকে। অর্থাৎ যে দেবতা যাতে তুষ্ট তাকে তাই দেওয়া উচিত। এছাড়াও, 'ভাল দ্যাও না পায় পুজা পানি, / মাটিয়া দ্যাওয়ের গড়াগড়ি।' — অর্থাৎ মানুষ পুজা করে ভয়-ভীতি থেকে আবার কখনো ভক্তির কারণে, কিন্তু রোগ ব্যাধি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে অপদেবতাদের সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্ঠা অধিক লক্ষ্য করা যায়। এরকম আরেকটি প্রবাদ আছে যেখানে বলা হয়েছে যে মানুষ অসন্তুষ্ট হলে কথা বলবে না বা সম্পর্ক রাখবে না কিন্তু দেবতা রুষ্ঠ হলে সর্বনাশ অনিবার্য। যেমন - ' মানষি ব্যাজার হলে ছাড়িয়া খাবে / দ্যাও ব্যাজার হলে মারিয়া নিগাবে।'

বিধির লিখন স্বয়ং ঈশ্বরও খণ্ডন করতে পারেন না — এই বিশ্বাস যুগ যুগ ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে। তারই প্রতিফলন দেখা যায়, 'বিধি হইল বাম্, / কি করিবে রাম।' (বিধি- বিধাতা, হইল- হল, বাম্- বিরূপ, করিবে- করবে) — এই প্রবাদটির মাধ্যমে। যেখানে বলা হয়েছে বিধাতা বিরূপ হলে ভগবান রামেরও কিছু করার নেই।

পুরির জগন্নাথদেব বহুল প্রসিদ্ধ দেবতা। যার প্রভাব রাজবংশী সমাজেও আমারা লক্ষ্য করি। যেমন একটি প্রবাদে বলা হয়েছে যে ইঁদুর-ছুঁচো হত্যা করে পাপ করেছি, এখন গলায় শুকনো মাছের মালা নিয়ে জগন্ননাথদেব দর্শনে চলেছি। যেমন - 'এ্যান্দুর ধেন্দুর মারি করেছি পাপ, / গালাত শুকটার মালা চলেছি জগন্নাথ।' (এ্যান্দুর- ইঁদুর,

ধেন্দুর- , মারি- মেরে, গালাত- গলায়, শুকটার- শুকনো মাছ, জগন্নাথ- পুরির শ্রী শ্রী জগন্নাথ ধাম) — প্রবাদটি ভণ্ড সন্যাসীদের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

রাজবংশী সমাজ-জীবনে শ্রী হরির প্রভাব অতীত কাল থেকে বর্তমানে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়, যার একটি উদাহরণ এই প্রবাদটি — 'মুখোত্ আসে হরি হরি/ মনত করে জুয়াচুরি।' (মুখোত্- মুখে, আসে- আছে, মনত্- মনে, জুয়াচুরি- জোচ্চুরি) — হরির প্রসঙ্গ টেনে কোন নারীর প্রতি বিদ্রুপ করার বিষয়টিও নজরে আসে, যেখানে বলা হয়েছে ঈশ্বরের নাম নিতে গিয়ে স্বামী সন্তানকে ভুলে যাওয়া বা ত্যাগ করা অর্থাৎ ভগবানের আরাধনা করতে গিয়ে সংসারের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা। প্রবাদটি হল- 'পাইসে হরির নাম ছাড়িসে ভাতার পুতের নাম।'

দেবী দুর্গার উল্লেখ মেলে এমন একটি প্রবাদ হল — 'মাও না পায় ভাজা ভুজা, তার ছাওয়া করে দুগ্‌গা পুজা।' অর্থাৎ মা সামান্য খাবার খেতে পায় না অথচ তার সন্তান দুর্গাপূজা করে। দুর্গাপূজা করতে গেলে অন্যান্য পুজার তুলনায় বেশী অর্থের প্রয়োজন হয়। আর সেখানে মায়ের প্রতি চরম অবহেলা করে আড়ম্বর প্রদর্শনের প্রতি বিদ্রুপ করা হয়েছে।

ঈশ্বর তাঁর ভক্তদের কাছে মূল্যবান কিছু আশা করেন না। সামান্য কিছু, সাধারণ কিছু যা ভক্তি ভরে প্রদান করা হয় তাতেই সন্তুষ্ট, কিন্তু তাও যদি প্রদান না করা হয় তবে পড়তে হয় ঈশ্বরের রোষের মুখে। এমন একটি প্রবাদের উল্লেখ পাওয়া যায় রাজবংশী সমাজে। যথা; 'পার্বতী আজা বান্দে ঘর / নাউ না দিলে হবে জ্বর/ দেও বায় একটা নাউ।'

'যম' হলেন মৃত্যুর দেবতা, মৃত্যু হল মানব জীবনের কঠিন এবং চরম সত্য যার থেকে মানুষ চিরকাল মুক্তি পেতে চায়, কিন্তু তা কখনোই সম্ভব নয়। আর সে কারণেই সমাজ জীবনের এক বিভীষিকা মহাজনের ঋণ এবং তার শোষণের চিত্রটি 'যম' দেবের প্রসঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। যথা; 'যমে ছাড়ে তাঁও আটোইয়ে না ছাড়ে।' — মহাজন ব্যক্তিরা তার ঋণ আদায়ের জন্য যেমন মৃত্যু পথযাত্রীকেও ক্ষমা করে না, ঠিক যেমন পরজীবী জীবেরা যার উপর বাস করে তাকে মৃত্যু পর্যন্ত মুক্তি দেয় না। এখানে মহাজনকে যমের থেকেও বিষম বলা হয়েছে। এছাড়াও 'যম' দেবতাকে কেন্দ্র করে আরেকটি প্রবাদ হল — ' যমে না বোঝে মঙ্গা ঋতু/ বিলাই না বোঝে মঙ্গা মাচ' — অর্থাৎ মৃত্যু অনিবার্য এবং তা কখনো মানুষের সুসময় বা দুঃসময় দেখে আসে না, ঠিক তেমনিভাবে বিড়ালও তার গৃহকর্তার ভাল-মন্দ অবস্থার বিচার করার পর মাছ খায় না। অন্যদিকে 'শিবের আশাৎ না পুজিলুং বিষহরি' — এই প্রবাদটির মধ্যে দুই দেবতার উল্লেখের অন্তরালে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমাদের কখনোই একজনের আশায় থেকে অন্যজনকে অবহেলা করা উচিৎ নয়। কারণ কেউ অবহেলার পাত্র নয়।

এবারে কিছু প্রবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে বিভিন্ন উপমা বা সরাসরি দেব-দেবীর প্রসঙ্গ উল্লেখ হয়েছে —

'যায় করে ঘিন ঘিন/ ওঠে কৃষ্ণ তিন দিন।' — অর্থাৎ মানুষকে ঘৃণা করলে ভগবানও অখুশি হন।

'কাপড়ার মধ্যে সাদা, নারীর মধ্যে রাধা।' — অর্থাৎ কাপরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রঙ সাদা আর নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ রমণি শ্রীরাধিকা বা শ্রীরাধা।

'রাম না জন্মিতে আমায়ণ' — অর্থাৎ রামের জন্ম না হতেই রামায়ণ (আমায়ণ) রচিত হয়েছিল। অর্থাৎ এখানে বিশ্বাস যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে।

'যাঁকো যে বাজন / তাঁকো করে নারায়ণ।' — অর্থাৎ অনিষ্ঠ্যকারী মানুষ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

'শ্যামও গেইচে, শ্যামের বাঁশিও গেইচে।' — অর্থাৎ জ্ঞাণী ব্যক্তি তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। তার স্মৃতি থাকলেও সেই জ্ঞানকে আমরা ফিরে পাই না।

৪.৯ সমাজের বহুমাত্রিক চিত্র: সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সামন্তবাদী শোষণ তথা ভূমি ব্যবস্থা, সামাজিক স্তরবিন্যাস, শ্রেণি বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণি দ্বন্দ্ব, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ব্যবস্থা, নগরায়ণ ও তৎকালীন নগরজীবন, নারীর সামাজিক

অবস্থান, দেবদেবীর চরিত্র নির্মাণে সমাজ বাস্তবতার প্রতিফলন — ইত্যাদি বিষয়গুলি সমাজের বহুমাত্রিক চিত্রের নানান প্রপঞ্চ। তা ভিন্ন আরও নানান বিষয় প্রবাদে উল্লেখ থাকে, সেগুলিও বর্তমান আলোচনায় গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হবার যোগ্য। আমরা এই পর্বে সমাজচিত্রের বিবিধ দিকগুলি তুলে ধরতে পারি।

মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনবদ্য দিক ফুটে উঠতে দেখা যায় নানা রাজবংশী প্রবাদে। এমনই একটি প্রবাদ হল — 'ছোটলোক বড় হইলে সীমানাত্ গাড়ে গাছ, / বড়লোক ছোট হইলে আগিনাত্ গজায় ঘাস।' (সীমানাত্- সীমানায়, গাড়ে- রোপন করে, আগিনাত্- উঠোনে) অর্থাৎ — দরিদ্র ব্যক্তি যদি বড় হয় বা ধনবান হয় তথাপি তার পূর্বের চরিত্রের পরিবর্তন হয় না। তারা সীমানায় গাছ লাগায়। অপরদিকে যদি ধনবান ব্যক্তি ভাগ্যক্রমে দরিদ্র হয়ে যায়, সেক্ষেত্রেও তার আচরণের কোন পরিবর্তন হয় না। পরিশ্রম না করার অভ্যেসের দরুন তার উঠোনে ঘাস গজায়। অর্থাৎ সময় পরিস্থিতি পরিবর্তিত হলেও মানুষের দীর্ঘদিনের অভ্যেস এবং আচার-আচরণের কোন পরিবর্তন হয় না। অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় মানব চরিত্রের এক অনবদ্য দিক ফুটে উঠতে দেখা যায় উল্লেখিত প্রবাদে। এই সূত্রেই উল্লেখ্য, সামাজিক বৈষম্যের এক অনবদ্য দিক ফুঁটে উঠতে দেখা যায় রাজবংশী প্রবাদে। যেমন: 'ধনীর মাথাত ধরে ছাতি, / নিধনীয়ার মাথাত্ লাথি।' (ধনীর- ধনবাণ ব্যক্তির, মাথাত্- মাথায়, ছাতি- ছাতা, নিধনীয়ার- নির্ধন ব্যক্তি) — অর্থাৎ ধনবাণ ব্যক্তির মাথায় ছাতা ধরে অথচ ধনহীন ব্যক্তির মাথায় লাথি মেরে তার প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করে। মানুষের তেলা মাথায় তেল দেওয়ার যে স্বভাব তাই প্রকাশ এই প্রবাদটি।

কঠোর হলেও বাস্তব, গ্রামীণ পরিবেশের একটি দিক হল হতদারিদ্র ও দুঃখময় জীবন। রাজবংশী বেশ কিছু প্রবাদে এই দিকটি নিপুণভাবে ধরা পড়েছে — 'প্যাটোত্ নাই ভাত্, / তায় বেরাশে মাঞ্জে দাঁত।' — (ভাত্- ভাত, বেরাশে- ব্রাশ দিয়ে, মাঞ্জে- মাজে বা পরিষ্কার করে) অর্থাৎ খাবার জন্য ভাত বা অন্ন নেই অথচ সেই ব্যক্তিই ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজে। অর্থনৈতিক ভাবে অস্বচ্ছল ব্যক্তির ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজার বিষয়টি গা-গঞ্জে অত্যন্ত বেমানান হিসেবেই দেখা হয় যা অর্থনৈতিক ভাবে অস্বচ্ছল ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা প্রকাশ করাকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে আলোচ্য প্রবাদে। হতদারিদ্র ও দুঃখময় জীবনের করুণ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় আরো একটি প্রবাদে — 'প্যাটের দুঃখে বৈরাগী হৈলং, / দ্যাশোতও আকাল পড়িল্।' (প্যাটের- পেটের, বৈরাগী- সন্ন্যাসী, হৈলং- হলাম, দ্যাশোতও- দেশেও, আকাল- অকাল বা দুর্ভিক্ষ) — অর্থাৎ ক্ষুধার তাড়নায় সন্ন্যাস গ্রহণ করলাম, যাতে ভিক্ষার অন্নে ক্ষুধা নিবৃতি হয়। দূর্ভাগ্যের বিষয় হল সেই সময় দেশেও আকাল দেখা দিল। দুঃখময় জীবনের করুণ বহিঃপ্রকাশ বর্তমান প্রবাদটি। নাগরিক জীবনের অত্যন্ত কঠোর চিত্র ধরা পড়েছে আরেকটি প্রবাদে — 'ধনী চাউল ভাজা খায় সকে, / গরীব চাউল ভাজা খায় ভোকে।' (চাউল- চাল, সকে- সখে, ভোকে- ক্ষুধায়) — অর্থাৎ ধনী ব্যক্তি চাল ভাজা খায় সখ করে কিন্তু গরীব ব্যক্তি চালভাজা খায় ক্ষুধার তাড়নায়।

এভাবে অন্বেষণ করলে দেখা যাবে দুঃখ দারিদ্র ভরা গ্রামীণ জীবনের অনবদ্য চিত্র স্থান পেয়েছে নানান প্রবাদে। হত-দরিদ্র গ্রামবাসীদের অনবদ্য জীবনালেখ্য হয়ে উঠেছে হাজারো রাজবংশী প্রবাদ।

পণপ্রথা অন্যতম সামাজিক অভিশাপ। রাজবংশী সমাজেও এই রীতির প্রচলন ছিল। তবে পণ প্রথার এ যেন উলটপুরাণ। পাত্রকে পাত্রী পক্ষের কাছে পণ দিয়েই বিয়ে করতে হয় — 'একশ টাকা খাল্তি / ত্যাও ক্যানে বউ কালটি?' (খাল্তি- কন্যাকে দেওয়া পণ, ত্যাও- তবুও, ক্যানে- কেনো, কালটি- কালো) — একশত টাকা পণের বিনিময়ে বিয়ে করেও বউ কালো হল — এই আক্ষেপ বর্তমান প্রবাদে চিত্রিত হয়েছে।

প্রতিবাদ চেতনা যেকোন চলমান সমাজকে যথার্ত দিশা দেখাতে সমর্থ্য। রাজবংশী লোকসমাজেও নানান লোকসংস্কৃতির উপাদানকে প্রতিবাদ চেতনা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে, আর তাতে সামাজিক নানান বিষয়ের প্রতিবাদ চেতনার নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, যেকোন চেতনা বিস্তারে লোকসাহিত্যের নানা উপাদান অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রবাদকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে নানান ইঙ্গিতবাহী প্রতিবাদী কথা রাজবংশী লোকসমাজ প্রকাশ করে থাকে। এমনই একটি জ্বলন্ত নিদর্শন হল আলোচ্য প্রবাদটি — 'ডারিকায় রুইয়ক ঠোকায় /

মরিবার ভয় না খায়।' (ডারিকা- এক ধরনের ছোট মাছ, রুইয়ক- রুই মাছ, ঠোকায়- ঠোকরানো, মরিবার- মৃত্যুর, ভয় না খায়- ভয় পায় না) — অর্থাৎ ডারিকা মাছ এক ধরনের অতি ক্ষুদ্র মাছ। এই মাছ তার থেকে আয়তনে হাজার গুণ বড় রুই মাছকে টক্কর দেয়। মৃত্যুর পরোয়া না করে। অর্থাৎ অন্যায়ের প্রতিবাদ যারা করে, তারা আয়তন বা ক্ষমতার ভয় করে না। নিজেরা ক্ষুদ্র হলেও মৃত্যুর ভয় না করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে যায়।

সহযোগিতামূলক সামাজিক অবস্থান সাম্য-সম্প্রীতির অনন্য নজির গড়ে তোলে। গ্রামীণ সমাজে একে অন্যের পাশে থেকে অন্যদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়। একে অন্যের বিপদে-আপদে পাশে থাকে। এমন নজির রাজবংশী প্রবাদে লক্ষ্য করা যায়: 'তুঞি খলিসা মুঞি খলিসা একে বিলের মাছ, / তুঞি মরিলে মরিম মুঞি মোর কমর ধরি থাক।' (তুঞি- তুই, খলিসা- এক প্রকার জিওল মাছ, মুঞি- আমি, একে- একই, বিলের- পুকুর বা জলাশয়, মোর- আমার, কমর- কোমর বা মাজা, ধরি থাক- ধরে থাক) — তুমিও খলিসা মাছ আমিও খলিসা মাছ, দুজনাই একই প্রজাতির সদস্য। ঠিক একারণেই তোমার কিছু হলে আমার ওপরেও তার প্রভাব পড়বে। তাই আমার কোমর ধরে থাক। অর্থাৎ সমাজের কোন এক সদস্য সমস্যায় পড়লে সকলেই সমস্যার সম্মুখীন হবে। ঐক্যবদ্ধভাবেই তার সমাধান সম্ভব। সকলের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে উল্লিখিত প্রবাদটিতে। অন্যদিকে, 'নিজের জাইতোক যাঞ চিনিবে / অন্যের জাইতোকও চিনিবে।' — বর্তমান বিবাদমান সাম্প্রদায়িক সংঘাতের প্রেক্ষিতে প্রবাদের এই আখ্যান বর্তমান সময়ের দাবিকে স্বীকৃতি দেয়। সাম্প্রদায়িক সংঘাত এড়াতে নিজের সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অন্য সম্প্রদায়কে জানার মধ্যেই অর্থাৎ 'নো ইউর নেইবার' — এটিই অন্যতম পন্থা বলে অনেকেই মনে করেন।

বিভিন্ন সমাজে জাতিগত ট্যাবু থেকে থাকে। ডোম সমাজেও এই বিধিনিষেধের উল্লেখ রয়েছে। রাজবংশী প্রবাদে সেই চিত্রই ধরা পড়েছে: 'ডোমোক নাগিল কুদিন, শুয়োরোক নাগায় বান্নি।' (ডোমোক- ডোম, নাগিল- লাগা বা শুরু হওয়া, কুদিন- খারাপ সময়, শুয়রোক- শুকর, নাগায়- লাগানো বা বারি মারা, বান্নি- ঝাড়ু) — অর্থাৎ ডোম জাতির মানুষেরা শুকর প্রতিপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তাই শুকর তাদের কাছে লক্ষ্মী স্বরূপ। এই শুকরের গায়ে যদি তারা ঝাড়ু দিয়ে বাড়ি দেয় তাহলে তাদের কু'দিন ঘনিয়ে এসেছে বলে মনে করা হয়। ঝাড়ুর বাড়ি অসম্মান বা অবজ্ঞাসূচক। এই প্রবাদটিতে ডোম সম্প্রদায়ের বৃত্তিকেন্দ্রিক বিধিনিষেধের উল্লেখ রয়েছে।

অতিথি-পরায়ণতায় রাজবংশী সমাজ বিশেষ গর্বের অংশীদার। চরিত্র বৈশিষ্ট্যে সহজ-সরল জীবনে অভ্যস্ত রাজবংশীরা অতিথি সম্পর্কে সদা সচেতন: 'অতিথক ছাড়িয়া না খাই ভাত / বাঘের কটিত্ না দেই হাত' — অর্থাৎ অতিথিকে ছেড়ে তারা কখনই খায় না বা আতিথ্যপণায় এঁরা সদা সচেতন, অন্যদিকে বাঘের কটিত হাত দিলে কী দশা হতে পারে সে বিষয়েও এঁরা অসচেতন নয়।

প্রবাদ অন্বেষণ করতে লাগলে দেখা যাবে 'সমাজের বহুমাত্রিক চিত্র' শীর্ষক আলোচনার ইতি টানা অসম্ভব। পাঠ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সমাজের বহুমাত্রিক চিত্রের কোন না কোন বিষয়গত পরিধিতে তা বিন্যস্ত করায় যায়।

৫. রাজবংশী সমাজ জীবনে প্রবাদের গুরুত্ব: লোকমুখে সৃষ্ট প্রবাদের মধ্যে সমাজমানসের দৈনন্দিন জীবন চর্চার নানান অভিজ্ঞতা সমাহিত থাকে। প্রবাদ এ কারণেই সমাজের প্রতিচ্ছবি বা দর্পণ। কথপোকথন কালে বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ ও বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে প্রবাদের প্রয়োগ করা হয়। রাজবংশী সমাজে প্রচলিত প্রবাদগুলির মধ্যে সাবলীলভাবে এই সমাজের চিত্রটি প্রস্ফুটিত হয়। এক কথায় বলা যেতে পারে রাজবংশী লোকজীবনে প্রবাদের প্রচলন ব্যাপকভাবে রয়েছে।

সমাজ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত হওয়ায় প্রবাদের মধ্যে ব্যঞ্জনাময়ভাবে ফুটে ওঠে সমাজ জীবনের প্রতিটি চিত্র। দীর্ঘ বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত হওয়ার কারণে সমাজের প্রায় প্রত্যেক অবস্থার চিত্র সহজ ও সাবলীলতায় চিত্রিত হয় প্রবাদে। দৈনন্দিন জীবনাচরণের নানান অভিজ্ঞতা যখন প্রবাদের মাধ্যমে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয় সে সময় অতি সহজেই আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নে সক্ষম হই। রাজবংশী সমাজে

প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে এই সমাজের সামাজিক চিত্রটির প্রকাশ অবলীলায় লক্ষ্য করা যায়। কথোপকথন কালে প্রবাদের প্রয়োগ বক্তব্যের তীক্ষ্ণতাবৃদ্ধিতে ও বক্তব্যের স্পষ্টতায় সহায়ক হয়ে থাকে। রাজবংশী সমাজে প্রচলিত প্রবাদগুলি এই সমাজের সামাজিক বিভিন্ন অবস্থার চিত্র এমনকি ঐতিহ্যপরম্পরায় বহমান সংস্কৃতির স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে সক্ষম। প্রবাদের মধ্যে সমাজের বিভিন্ন অবস্থার পাশাপাশি কোন এক বিশেষ সময়কালও উদ্ভাষিত হয়ে থাকে। এই সমাজে প্রচলিত প্রবাদগুলির মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্ম পূর্ববর্তী সময়ের সামাজিক প্রপঞ্চগুলি সম্পর্কে ধারণা পেয়ে থাকে, যেমনটা অন্যান্য সমাজের প্রবাদের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে।

৬. শেষের কথা: সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোনের নিরিখে কোনও সাহিত্য আঙ্গিককে পাঠ করলে স্বাভাবিকভাবেই সমাজের ছায়াপাত ফুঁটে ওঠে। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে প্রবাদ অধ্যয়ন ও চর্চার উপাত্ত হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেননা সমাজ-সংগঠন, সামাজিক ইতিহাস, আঞ্চলিক ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ক চর্চায় বা গবেষণায় প্রবাদ বিভিন্নভাবে তথ্য বা উপাত্তের জোগান দিয়ে থাকে। অন্যদিকে, প্রবাদে নানা সময় রূপকের আড়ালে বহু বক্তব্যের উপস্থাপন হয়ে থাকে। জনজীবনের নানা ভাবনা স্বতঃস্বারিত থাকে প্রবাদে — সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে তার পর্যালোচনা রাজবংশী জনজীবনকে নতুনভাবে অন্বেষণের দিশা দেখাবে। অন্যের কাছে বিরাগভাজন হবার ভয়ে বা সরাসরি বলতে না পারার কারণে যে বাস্তব কথাটা আমরা মুখফুটে উচ্চারণ করতে পারি না, সেই বক্তব্যই উপমাত্বক বা রূপকের অন্তরালে প্রেরক গ্রাহকের কাছে প্রবাদ ছুঁড়ে পৌছে দেন অত্যন্ত সাবলীলভাবে সহজ-সরল ভাষায়। লোকসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সঞ্চরণশীলতা যার উপস্থিতি প্রবাদে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই সঞ্চরণশীলতার মাধ্যমেই অতি সহজে প্রবাদ সমাজে দিনের পর দিন লালিত-পালিত হয়ে থাকে। আমরা লক্ষ্য করেছি রাজবংশী প্রবাদে উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে, ভূমি ব্যবস্থা (সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সামন্তবাদী শোষণ), সামাজিক স্তরবিন্যাস, শ্রেণি বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণি দ্বন্দ্ব, ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা ব্যবস্থা, নগরায়ণ ও তৎকালীন নগরজীবন, নারীর সামাজিক অবস্থান, দেবদেবীর চরিত্র নির্মানে সমাজ বাস্তবতার প্রতিফলন, সমাজের বহুমাত্রিক চিত্র - ইত্যাদির বহুবিধ দিক নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে।

সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও নন্দনতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণের ভঙ্গি, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য যে এক নয় — একথা সর্বজন বিদিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রবাদের বিচার-বিশ্লেষণে সাহিত্যতত্ত্বগত নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বেশি করে সমাদর পেয়েছে, পৃথকভাবে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা সেভাবে নজরে আসেনা। কখন-সখনও নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনায় সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা যৎসামান্য স্থান পেয়েছে মাত্র। কিন্তু এই দু'ই ভঙ্গির উৎসভূমি, ধারণা, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে পৃথক স্বতন্ত্র ধারা এবং সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তিই হল সমাজবিদ্যামূলক (Social Science) বিভিন্ন 'Tool'। সেখানে নন্দনতত্ত্বের আলোচনার 'Tool' হল 'Aesthetic'। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রবাদ হল লোকসাহিত্য তথা লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান (Genre)। বিজ্ঞানগত ভঙ্গিতে এই আঙ্গিকের বিচার-বিশ্লেষণ লোকসংস্কৃতিবিদ্যার (Folkloristics) অধীনে সম্পন্ন হয়; যার বেশিরভাগ 'Tool' সমাজবিদ্যা (Social Science) জাত। প্রবাদ চর্চায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে সাহিত্য বা নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তাসূত্রের ভিত্তিতে আলোচনা। উপেক্ষিত হয়েছে সমাজবিদ্যামূলক (Social Science) আলোচনার বিভিন্ন'Tool'। বর্তমান আলোচনায় সেই শূন্যতাকে মাথায় রেখে সমাজবিজ্ঞানের (Social Science) চিন্তাসূত্রকে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। রাজবংশী প্রবাদের পালস (Pulse) বুঝতে, রাজবংশীদের পালস (Pulse) বুঝতে সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে প্রবাদের বহূমুখীন অধ্যয়ন রাজবংশী প্রবাদচর্চার ইতিহাসে বিশেষ মাত্রা পেতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ইসলাম, শেখ মকবুল, *লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান পদ্ধতি ও প্রয়োগ,* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১১, মুদ্রিত।
২. চৌধুরী, আনোয়ার উল্লাহ, ইশরাত শামীম, মুহম্মদ হাবিবুর রহমান ও মোহাম্মদ ইমদাদুল হক, *সমাজবিজ্ঞান শব্দকোষ,* অনন্যা প্রকাশনী: ঢাকা, ২০১৬, মুদ্রিত।

৩. বন্দোপাধ্যায়, শেখর, অভিজিৎ দাশগুপ্ত (অনুবাদ), *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ,* শিনকুচি তানিগুচি, উত্তরবঙ্গ ও অসমের রাজবংশী সম্প্রদায় এবং ভূমি ব্যবস্থা পরিবর্তনশীল কাঠামো, দিল্লি: আই সি বি এস, ১৯৯৮, মুদ্রিত।
৪. মহাপাত্র, অনাদিকুমার, *বিষয় সমাজতত্ত্ব প্রত্যয় ও প্রতিষ্ঠান,* সুহৃদ পাবলিকেশন: কলকাতা, ২০১৭, মুদ্রিত।
৫. সরকার, শিপ্রা, *সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব প্রসঙ্গ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য,* আজকাল প্রকাশনী: ঢাকা, ২০০৭, মুদ্রিত।

তথ্যঋণ:

কুণ্ডু, মণীন্দ্রলাল, *বঙ্গীয় রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধা,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৮, মুদ্রিত।
করণ, মদনচন্দ্র, *প্রবাদের স্বরূপ ও সীমানা:বাঙ্গালীর পরিবার জীবন,* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১০ (বঙ্গাব্দ), মুদ্রিত।
ডাকুয়া, অরবিন্দ, *রাজবংশী সমাজের প্রবাদ প্রবচন,* কুচবিহার: উপ্জনভুই পাব্লিশার্স, ২০০৪, মুদ্রিত।
বর্মন, উপেন্দ্রনাথ, *রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ-প্রবচন ও হেঁয়ালী,* জলপাইগুড়ি, ১৩৮৫ (বঙ্গাব্দ), মুদ্রিত।

সহায়ক গবেষণা অভিসন্দর্ভ:

প্রধান, তপন, রায়, *উত্তরবঙ্গের রাজবংশী প্রবাদ প্রবচন: একটি আর্থসামাজিক সমীক্ষণ,* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪, মুদ্রিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: প্রবন্ধের চিন্তন সূত্র গ্রহণ করেছি শিপ্রা সরকারের *সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব প্রসঙ্গ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য* শীর্ষক গ্রন্থ থেকে এবং বর্তমান নিবন্ধে উল্লেখিত বিভিন্ন প্রবাদ মূলত অরবিন্দ ডাকুয়ার *রাজবংশী সমাজের প্রবাদ প্রবচন* শীর্ষক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত এবং ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত।